# আরামবাগের নেতাজী মহাবিদ্যালয় - ফিরে দেখা

ড. স্বপন কুমার লাহা

"কথা কও, কথা কও
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে কেন বসে চেয়ে রও?
কথা কও, কথা কও।"

অতীত যে কথা বলে, কথা বলে সঙ্গোপনে তা উপলব্ধি করলাম ২০২২-এর ১লা আগষ্ট নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে উপস্থিত থেকে। ওই কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ ড. অসীম কুমার দে মহাশয় তাঁর স্বাগত ভাষণে এবং ওই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র তথা অধ্যাপক দুলালচন্দ্র মাল মহাশয় তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন যে, স্বাধীনতালাভের পর ১৯৪৮ সালের ১লা আগষ্ট সর্বপ্রথম এই মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন আরামবাগ মহকুমার অন্যতম শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল তাঁর কয়েকজন উদারমনা সহযোগী শিক্ষাব্রতীদের নিয়ে। ডাঃ পাল তাঁর অন্যতম শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি নেতাজী সুভাষের নামে এই কলেজটির নামকরণ করেন। কলেজটি সর্বপ্রথম শুরু হয়েছিল কালিপুরে (বিষ্ণুপুর মৌজা) দ্বারকেশ্বর নদের পশ্চিমতীরে (বর্তমান ১৮ নং ওয়ার্ড) আরামবাগের বাসিন্দা সত্যেন্দ্রনারায়ণ আঢ্য মহাশয়ের বাসভবনে। উল্লেখ্য, ওই সময়ে এই অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার কোনো সুযোগ-সুবিধা ছিল না। নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজকে শিক্ষায় আলোকিত করতে আলোকবর্তিকা নিয়ে সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছিলেন ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল ও তাঁর অনুরাগী গোঘাট ও আরামবাগ থানার কিছু শিক্ষাব্রতী। এই কলেজটি প্রথম বছরে সর্বসাকুল্যে মাত্র ৯৩ জন ছাত্র নিয়ে পঠন-পাঠন শুরু করে। বর্তমানে তা প্রায় ৫০০০-এর কাছাকাছি। উল্লেখ্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে (১৯৪৮-১৯৫৭) এই কলেজটিতে 'ইন্টারমিডিয়েট কোর্স' পড়ানো হত। ১৯৫৭ সালে এটি ডিগ্রি কলেজে উন্নীত হয় এবং ১৯৬০ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকেই এই মহাবিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে আসে।

বস্তুতপক্ষে, এই মহাবিদ্যালয়ে দীর্ঘ ৩৭ বছর (১৯৮২-২০১৯) ধরে আংশিক সময়ের ও অতিথি অধ্যাপক হিসাবে শিক্ষকতার সুযোগ পেয়ে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। তার প্রেক্ষিতে স্মৃতির সরণি বেয়ে এই মহাবিদ্যালয়কে ফিরে দেখার জন্য কলম ধরলাম। উল্লেখ্য, ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই কলেজে আমার পার্টটাইম শিক্ষকতার পথ চলা শুরু। বাণিজ্য বিভাগের ক্লাস হত সান্ধ্য বিভাগে। আমি হুগলী জেলার ডিহিবাগনান কে. বি. রায় উচ্চবিদ্যালয়ে অর্থনীতির শিক্ষক হিসাবে স্কুলের সব ক্লাস নিয়ে বৃহস্পতিবার

* প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক, বাণিজ্য ও অর্থনীতি বিভাগ

স্কুল থেকে পাঁচ পিরিয়ডের পর কলেজে আসতাম এবং শনিবার টিফিনে ছুটির পর কলেজে আসতাম। বৃহস্পতিবার আমি ৫টা থেকে দুটি ক্লাস নিতাম এবং শনিবার ৩.৩০ থেকে দুটো ক্লাস নিতাম অ্যাকাউন্টেন্সির ম্যানেজারিয়াল ইকোনমিক্সের যেটি অনার্স পেপার ছিল। আর পাসকোর্সের পেপারটি পড়াতেন বেঙ্গাই কলেজের অধ্যাপক সুকুমার ব্যানার্জী মহোদয়। তখন কলেজের ক্লাসরুম ও অন্যান্য পরিকাঠামো ছিল খুবই অনুন্নত। এই কারণে কমার্স বিভাগের ক্লাস শুরু হতো দুটো পঁয়তাল্লিশ থেকে এবং শেষ হত সাড়ে সাতটায়। তখন ক্লাসরুমে ইলেকট্রিসিটির তেমন সুব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষাকর্মী মহাদেবদা ক্লাসরুমে ৮-১০টা হ্যাজাক লাইট দিয়ে যেতেন। স্টাফরুমের পশ্চিমদিকে ছিল ছোটোখাটো লাইব্রেরি। গ্রন্থাগারিক ছিলেন শ্রদ্ধেয় অরুণকুমার গুপ্ত, সহকারি গ্রন্থাগারিক ছিলেন অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এবং সহযোগী ছিলেন শিশির কুণ্ডু ও দেবব্রত ঘোষ। যতদূর মনে পড়ে প্রাথমিকভাবে ক্লাসে যাবার আগে রেফারেন্স বই হিসেবে আমি ভারসানি ও মাহেশ্বরী-র 'ম্যানেজারিয়াল ইকোনমিকস্' বইটি লাইব্রেরি থেকে নিয়ে যেতাম। ছাত্রছাত্রীদের তখন ক্লাস করার বিষয়ে ছিল ঐকান্তিক নিষ্ঠা। ফলে আমি ক্লাস নিয়ে খুব তৃপ্তি পেতাম। সেই সময়ের অধিকাংশ ছাত্রই কলেজ থেকে পাস করে পরবর্তীকালে কোন না কোন জায়গায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেউ কেউ বিভিন্ন কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগ পেয়েছে। উল্লেখ্য, এই কলেজে আমার প্রত্যক্ষ ছাত্র তিলকনাথ ঘোষ বর্তমানে কমার্স বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। এছাড়াও আমার ছাত্র কৃষ্ণেন্দু সেন বর্তমানে কলকাতার বিজয়গড় কলেজে অধ্যাপনা করে।

প্রাথমিকভাবে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের আমি সরাসরি ছাত্র ছিলাম না। কারণ আমি কামারপুকুর সারদা-রামকৃষ্ণ বিদ্যা মহাপীঠের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র ছিলাম। তাই এই কলেজের প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কোন ধারণা আমার ছিলনা। এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র শ্রদ্ধেয় ব্রজমোহন কুণ্ডু, অধ্যাপক দুলালচন্দ্র মাল এবং সমকালীন কিছু অধ্যাপকের কাছে জানতে পারলাম এই কলেজের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। স্বাধীনতার আগে এই মহকুমায় না ছিল শিক্ষার সুব্যবস্থা, না ছিল স্বাস্থ্য রক্ষার সুব্যবস্থা, না ছিল যাতায়াতের পথঘাট, যানবাহন। এহেন অনগ্রসর অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নে মহকুমাকে সাজিয়ে তোলার জন্য যিনি কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তিনি হলেন ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল। ফরোয়ার্ড ব্লকের অনুরাগী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মাননীয় অশোক ঘোষের লেখা থেকে জানা যায় যে, দেশ স্বাধীন হবার আগে আরামবাগ মহকুমায় কোনও কলেজ গড়ে ওঠেনি। ডাঃ পালের জীবনে আক্ষেপ ছিল সেটাই। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৪৮ সালে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল কংগ্রেস - যার নেতৃত্বে ছিলেন আরামবাগের গান্ধী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অতুল্য ঘোষ প্রমুখ। আরামবাগ রামমোহন হলে এক কনভেনশনের মধ্যে দিয়ে আরামবাগে একটি কলেজ স্থাপনের কথা ঘোষণা করা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ডাঃ পাল বলেন ঃ "আরামবাগে নেতাজীর নামে একটি কলেজ স্থাপনের ইচ্ছা আছে। আগামী

চার মাসের মধ্যেই এই আরামবাগেই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামে একটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবই - এটাই আমার চ্যালেঞ্জ।" তিনমাসের মধ্যেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় ১৯৪৮ সালে ডাঃ পাল কালিপুরে দ্বারকেশ্বর নদের পশ্চিম তীরে শিক্ষাব্রতী সত্যেন্দ্রনারায়ণ আঢ্য, ফকিরচন্দ্র পাল, কালী মুখার্জী, অমর আঢ্য, প্রসাদ বল্লভ ও আরো অনেকের সহযোগিতা নিয়ে নেতাজীর আদর্শে দীক্ষিত নেতাজীর নামে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সত্যেন্দ্রনারায়ণ আঢ্য মহাশয়ের বাড়িতেই প্রথম ক্লাস শুরু হয়। এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন অধ্যাপক ভবানীচরণ গুহ। তারপরে গুরুদাস সেন এবং অনিলবরণ দাস মহাশয়। ফকির পাল মহাশয়ের বাড়িতে হোস্টেল করা হয়েছিল। পরে বর্তমান স্থানে এই কলেজ স্থানান্তরিত হয়। ১৯৪৮ সালে কলেজটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। তখন ইন্টারমিডিয়েট পড়ানো হত। পরে ১৯৬০ সালে এটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসে এবং প্রি-ইউনিভার্সিটি ও পাসকোর্স পড়ানো শুরু হয়। ১৯৮০ সালে অধ্যক্ষের পদে যোগদান করেন সনৎ ব্যানার্জী মহাশয়। নানা অসুবিধার কারণে অধ্যক্ষ  সনৎবাবু এই কলেজ থেকে উত্তরপাড়ায় চলে গেলেন। ফলে কিছুদিন কলেজের পরিচালনার দায়িত্ব (টিচার-ইন-চার্জ) পালন করেন অধ্যাপক  কমলবাবু, অধ্যাপক দুলালবাবু, অধ্যাপক রাধাগোবিন্দবাবু প্রমুখ। তারপর ১৯৮৫ সালের আগষ্ট মাসে নেতাজী কলেজের প্রাক্তন ছাত্র শ্রদ্ধেয় বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ এই কলেজে স্থায়ী অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন এবং সেদিনই স্যারের সঙ্গে পরিচয় হয়। তারপর তিনি কলেজের পরিকাঠামোর ওপরে জোর দিলেন। তদানীন্তন বামফ্রন্টের শিক্ষামন্ত্রী সুদর্শন রায় চৌধুরীকে স্যার একটা বিশেষ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের জন্য নিয়ে আসেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স খোলার জন্য অনুমতি আদায় করেন। তারপর থেকে বিজয়বাবুর আমলে (আগষ্ট, ১৯৮৫ - ফেব্রুয়ারি ২০০৩) মোট প্রায় ১৩টি বিষয়ে অনার্স পড়ানোর কাজ চলতে থাকে। সরকারি অনুদানের স্বচ্ছলতায় এবং অধ্যক্ষ স্যারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কলেজের বিল্ডিং ক্রমশ দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে-উচ্চতায় গগনচুম্বী হতে লাগলো আমার চোখের সামনেই।

অধ্যক্ষ বিজয়বাবুর অবসরের পর ২০০৩ সালের মার্চ মাসের ১ তারিখে আরামবাগের ভূমিপুত্র ড. অসীম কুমার দে মহোদয় এই কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সার্থক পরিকল্পনার মাধ্যমে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের পরিকাঠামোয় আমূল পরিবর্তন শুরু হয়, যাকে বলা হয় মহাবিদ্যালয়ের এক 'উত্তরণের কাল'। অর্থনীতির ভাষায় যাকে বলা হয় কলেজের take-off-stage বা স্বয়ংসম্পূর্ণতার স্তর। একদিকে তিনি পরিকাঠামো উন্নয়নে যেমন উদ্যোগ নিলেন, তেমনি বিভিন্ন বিষয়ে যাতে স্থানীয় শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করার সুযোগ পায়, সেদিকে নজর দিলেন। ইতিমধ্যে বিজয়বাবুর সময়কালে মোট ১৩টি বিষয়ে কলেজে অনার্স ও পাসকোর্স পড়ানো হত। ২০০৩-এর পর থেকে আরও কয়েকটি বিষয়ে

অনার্স কোর্স পড়ানো শুরু হয়। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল Computer Science, Computer Application (BCA), Environmental Science, Plant Protection, Electronic Science, Music, Santhali, Physical Education, Business Administration (BBA)। বর্তমানে ২১টি বিষয়ে অনার্স ও ৩টি বিষয়ে পাসকোর্সে পঠন-পাঠন হয় অভিজ্ঞ অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের মাধ্যমে। প্রতি বৎসর মহাবিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল অন্যান্য কলেজের ঈর্ষার কারণ।

২০১১ সাল থেকে কলেজের গ্রন্থাগারটি যুক্ত হয়েছে INFLIBNET NLIST-এ। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, তিনতলা বিল্ডিং-এ বিপুল সংখ্যক টেক্সট বুক, রেফারেন্স বুক (৯০০০), সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা, কমপিটিটিভ পত্রিকা, জার্নাল, ই-জার্নাল-এ সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার কোনও কলেজে আছে কিনা সন্দেহ হয়। গ্রন্থাগারিক বাসুদেববাবু ও সঞ্জয়বাবুর সুযোগ্য পরিচালনায় এখন যে কোনো শিক্ষার্থী, এমনকি গবেষকও এই গ্রন্থাগার থেকে সমৃদ্ধ হতে পারে। শিক্ষার্থী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকারাও পৃথক জায়গায় বসে গ্রন্থাগারে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পান। তাছাড়া প্রত্যেক বিভাগের পৃথক গ্রন্থাগার ও বসার স্থান শিক্ষকদের নতুন উদ্দীপনা জোগায়। কমার্স বিভাগ ও অর্থনীতি বিভাগ ছাড়াও আমি B.B.A. বিভাগে পড়ানোর সুযোগ পেয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছি মনে করি। এই বিভাগে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে (প্রোজেক্টর ব্যবহার করে) পড়ানোর জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাড়ে।

সরকারি গ্র্যান্টের সহযোগিতায় UGC Building, Science Building, B. M. Building, 3-storied Library Building, Smart Classroom, Yoga Training, Boys Hostel, Girls Hostel, Heritage Building ইত্যাদি গড়ে উঠেছে, যা অতীতের সবকিছুকেই ম্লান করে দেয়। বস্তুতপক্ষে, এই মহাবিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন যেভাবে ঘটেছে তা অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েরও নেই বললে চলে। আর একটি বিষয় উল্লেখ করতেই হয় যে, ২০০৮ সালে এই কলেজ বাংলা বিভাগে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পড়ানোর জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করেছে। বর্তমানে এর সুফল লাভ করছে নিকট ও দূরবর্তী ছাত্র-ছাত্রীরা।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় এই নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ আরামবাগের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের অনেক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ। কারণ আরামবাগ মহকুমা হল কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়ে। তাছাড়া, প্রত্যন্ত গ্রামগুলি থেকে দীর্ঘকাল ধরে রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা ছিল না। অধিকাংশ পরিবারের ছেলেমেয়েরা কোনোরকমে মাধ্যমিক, বড়জোর উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে অতি সাধারণ কোনো জীবিকা বেছে নিত। উচ্চশিক্ষা পাওয়া ছিল তাদের কাছে কল্পনাবিলাস মাত্র। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মহিলারা কোনোদিন বি.এ., বি.এস.সি., বি.কম. পাস করবে, তা ভাবাই যেত না। শুধু তাই নয়, তপশিলী জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘু শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা কলেজে পড়ে কোনো চাকুরি সন্ধান

করতে পারবে তা ছিল স্বপ্ন মাত্র। ২০১১ সালে হাওড়া-তারকেশ্বর-আরামবাগ-গোঘাট পর্যন্ত রেল চালু হবার ফলে ট্রেনে চেপে দূরদূরান্ত থেকে বহু ছেলেমেয়ে কলেজে পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছে। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ বেড়েছে। তাছাড়া, সাম্প্রতিককালে (২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে) এই কলেজে Career Counselling-এর মাধ্যমে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা চালু হয়েছে, যাতে শহর গ্রামাঞ্চলের কিছু শিক্ষার্থী কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে।

সর্বোপরি, এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (NSOU) ও ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (IGNOU)'। এই স্টাডি সেন্টারগুলি থাকার ফলে যে বা যাঁরা এক সময় আর্থিক বা অন্য কোনো সাংসারিক কারণে কলেজে পড়ার সুযোগ পায়নি, তারাও এগুলি থেকে বি.এ., বি.এস.সি., বি.কম., এম.এ., এম.এস.সি., এম.কম. পাশ করার সহজ সুযোগ লাভে সক্ষম হয়। এছাড়া এই কলেজে মিউজিকে অনার্স পড়ার সুযোগ পাবার ফলে গ্রামাঞ্চলের মেয়েরাও মিউজিকে দক্ষতা অর্জন করতে পারছে এবং নিজেদের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারছে। এই কলেজে সাঁওতালি ভাষায় অনার্স, ফিজিক্যাল এডুকেশনে পাসকোর্স ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ থাকায় তপশিলী জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরাও উপকৃত হয়েছে, যাতে করে তাদের জীবন-জীবিকার পরিবর্তন ঘটেছে। এইভাবে তারা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পাচ্ছে। এককথায় বলা যেতে পারে, আরামবাগ মহকুমাসহ অন্যান্য মহকুমার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলির ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে।

এই কলেজে একদিকে যেমন শিক্ষার প্রসারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তেমনি মানব সম্পদ উন্নয়নেও ততোধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করি। স্বাধীনোত্তরকালে কৃষিভিত্তিক আরামবাগ মহকুমার গ্রামাঞ্চলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে পাহাড় প্রমাণ বাধা ছিল, আজ আর তা নেই। বিশেষ করে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে। নেতাজী মহাবিদ্যালয় (১৯৪৮) ও আরামবাগ গার্লস কলেজ (১৯৯৬) প্রতিষ্ঠার পর থেকে এবং নানা রুটের বাস চলাচল ও আরামবাগে রেললাইন চালুর পর থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েরাও বর্তমানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে এবং অনেকেই অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার তৈরির বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অবশ্য বিগত দু'বছরে করোনা মহামারীর কারণে অন-লাইনে পড়ার মতো অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর পরিকাঠামো (যেমন - বিদ্যুতের জোগান, স্মার্টফোনের অভাব ইত্যাদি) না থাকায় তারা পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়েছে। তথাপি বলতেই হয় বর্তমান আরামবাগ মহকুমার আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় নেতাজী মহাবিদ্যালয় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পঠন-পাঠনে ও গুণগত মানের বিচারে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের একটি বিশেষ মডেল হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে সন্দেহ নেই। এই মহাবিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল ও শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে NAAC মহাবিদ্যালয়কে B++

Grade -এ ভূষিত করে। আমি মনে করি আরও কিছু বিষয়ে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্স পড়ানোর সুযোগ বাড়লে এতদ্‌অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীগণ উপকৃত হবে এবং বিভিন্ন কোর্স সম্পূর্ণ করে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

পরিশেষে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদ্‌যাপনের অংশীদার হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আগামী দিনগুলিতে এই কলেজের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও উত্তরণ এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। এই মহাবিদ্যালয়ে চাওয়া-পাওয়া সম্পর্কে বিশ্বকবির কিছু কথা ধার করে বলতেই হয় -

“যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই
এই জ্যোতিঃসমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি
ধন্য আমি তাই ...।”

# পূর্ণতার দিকে
## অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়

"ওঁ পূর্ণমদং পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।।"

জ্ঞান তথা বিদ্যাও পূর্ণ এবং অনন্ত। আমার করতলে ধৃত যৎসামান্য আচমনীয় জলের মতো যে সামান্য বিদ্যা আমি এই মহাবিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত হয়েছি - তাতে সেই পূর্ণই প্রতিবিম্বিত হয়ে আমার জ্ঞানতৃষ্ণাকে বর্ধিত করে এখনও বহমান।

মহাবিদ্যালয়ের পঁচাত্তর বৎসর পূর্তি উৎসবের আঙিনায় দাঁড়িয়ে সুদূর অতীতের দিকে তাকালে আজও যেন দেখতে পাই কৈশোর-উত্তীর্ণ নিজেকে - যে নেতাজীর নামাঙ্কিত এই মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অবাক বিস্ময়ে আপন মনে তাকিয়ে আছে।

এই প্রতিষ্ঠান ১৯৪৮ সালের ১লা আগষ্ট উদ্বোধিত হয়ে পথচলা শুরু করেছিল। তার নয় মাস পূর্বে আমার জন্ম। তাই মহাবিদ্যালয় এবং আমি সমবয়সী বলা যায়। ছাত্রজীবন এবং কর্মজীবন মিলিয়ে মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ সংযোগ ৩৮ বছরের।

পঁচাত্তর বৎসর পূর্তিকালে স্মরণ করি পরম শ্রদ্ধেয় ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল মহাশয় এবং কালিপুর ও আরামবাগের সেইসব উদ্যোগী এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের - যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কালিপুরের মতো পিছিয়ে থাকা অনুন্নত গ্রামে এই মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল, যার প্রসাদে আরামবাগ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় উচ্চশিক্ষার সূর্যকিরণ ছড়িয়ে পড়েছিল। আজ পর্যন্ত অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী এখান থেকে শিক্ষালাভ করে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয় উত্তীর্ণ হয়ে কর্মক্ষেত্রে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন।

আমার ছাত্রজীবনে এখানে বাংলা আর অঙ্ক ছাড়া অন্য বিষয়ে অনার্স পড়া যেত না। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশি না হলেও পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষের অভাব ছিল। বর্তমান বি. এম বিল্ডিং-এর জায়গায় খড়ে ছাওয়া কয়েকটি ছোট ছোট ঘরে অনার্স ক্লাস চলত। এর পশ্চিমদিকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা জলজ উদ্ভিদে ভরা একটি ডোবা। তার পশ্চিমপাড়ে ছাত্রাবাস এবং দক্ষিণদিকে রান্না-খাবার ঘর। বর্তমানে সেই ডোবা ভরাট করে অনেক গাছ লাগানো হয়েছে। খড়ের চালাঘর এবং সেই ছাত্রাবাস এখন নেই। সুদৃশ্য বি. এম বিল্ডিং ও তৎসংলগ্ন পূর্বতন খেলার মাঠের প্রভুত উন্নয়ন ঘটেছে। খেলার মাঠ বর্তমানে প্রাচীর বেষ্টিত এবং মাঠের পূর্বদিকে সুন্দর

* প্রাক্তন ছাত্র ও প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক

প্রবেশদ্বার নির্মিত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভিন্ন জায়গায় ছাত্র-ছাত্রী নিবাস তৈরি হয়েছে, যা দর্শনীয়। আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যও আলাদা আবাস তৈরি হয়েছে। আমার ছাত্র জীবনে কলেজ প্রাঙ্গনে আমতলার পাশেই দোতলা বাড়িটির একতলায় ছিল ছাত্রীদের কমনরুম। উপরে ছিল অধ্যক্ষের অফিস ও পাশের ঘরে একাউন্টস অফিস। নীচের তলায় ছিল জেনারেল অফিস আর স্টাফ রুম অর্থাৎ অধ্যাপকদের বসার জায়গা।

সে সময় অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রদ্ধেয় চিত্তপ্রিয় রায় এবং সহঅধ্যক্ষ ছিলেন পীযূষকান্তি পাল। তাঁরা উভয়েই প্রয়াত হয়েছেন। তাঁদের স্নেহ এবং আনুকূল্য আমার পাথেয় হয়ে আছে। পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত বাড়িটির দোতলা সম্পূর্ণ হলে এখানে গ্রন্থাগার চলে আসে। তার আগে নীচে গ্রন্থাগার থাকার সময় প্রয়াত দুর্গাকিঙ্কর মুখার্জী করণিক হয়েও গ্রন্থাগার দেখাশোনা করতেন। সেখানে বসে পড়ার জায়গা প্রায় ছিল না। গ্রন্থাগার দোতলায় স্থানান্তরিত হলে এবং শ্রীযুক্ত অরুণ কুমার গুপ্ত প্রথম গ্রন্থাগারিক হিসাবে যোগ দেবার পর অবস্থার উন্নতি ঘটে।

ছাত্রাবস্থায় কলেজ প্রাঙ্গনের পশ্চিমদিকে টিনে ছাওয়া উত্তর-দক্ষিণে লম্বা পূর্বমুখী বাড়িটিতে কয়েকটি ঘর ছিল। সেখানে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিভাগের ল্যাবরেটরি চলত। মাঝের একটি ঘরে ছিল ছেলেদের কমনরুম। সেখানে কয়েকটি বেঞ্চ এবং একটি টেবিল টেনিস বোর্ড ছিল। অবসরে কিছু ছাত্র ব্যবহার করত। সেখানে এখন তিনতলা বাড়ি তৈরি হয়েছে। দক্ষিণদিকের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলেই ছিল গ্রন্থাগার। অবশ্য তার আগে অধ্যক্ষ এবং অ্যাকাউন্টস অফিসের পার্শ্ববর্তী দোতলা থেকে গ্রন্থাগার সরানো হয়েছিল প্রাঙ্গনের উত্তরদিকে দক্ষিণমুখী একতলা বাড়ির মাঝের বড় হলঘরে (এখন যেখানে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ)। এসব আমার কর্মজীবনের ঘটনা। বর্তমানে গ্রন্থাগারের জন্য আলাদা ভবন তৈরি হয়েছে। যা এখন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। এছাড়া প্রায় সব বিভাগেই বিভাগীয় গ্রন্থাগার তৈরি হয়েছে।

ছাত্রজীবনের অধ্যাপকদের কথা কখনোই ভোলার নয়। তাঁদের সান্নিধ্য ও উপদেশ থেকে আমরা কখনও বঞ্চিত হতাম না। সকলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক রমাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। বাংলার অধ্যাপক রমাপ্রসাদবাবুর কাছে নেতাজী সম্পর্কে ও স্বাধীনতা আন্দোলন বিষয়ে অনেক জেনেছি। এই প্রসঙ্গে মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের সান্নিধ্যে আসার ফলে নেতাজী সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। নেতাজীর লেখা কিছু পত্র পুস্তিকাকারে তাঁর কাছে পেয়েছিলাম। ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন প্রয়াত রবীন ঘোষ মহাশয়। দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় তাঁর পরিচালনায় সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' নাটক আমরা মঞ্চস্থ করেছিলাম। নারী চরিত্রে ছেলেরা অভিনয় করেছিল। চন্দননগর থেকে দৃশ্যসজ্জা ও আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সে সময় আন্তঃশ্রেণী ফুটবল প্রতিযোগিতা হতো। তৃতীয় বর্ষে পড়ার সময় ফুটবল প্রতিযোগিতায়

বিজয়ী হয়ে আমরা পুরস্কার পেয়েছিলাম। শীতের সময় মাঠে অল্পস্বল্প ক্রিকেট চলত। বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হতো। ক্রীড়া বিভাগ এবং এন সি সি-র একটি ইউনিটের দায়িত্বে ছিলেন শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র মাল মহাশয়। উনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবেও আমাদের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। সে সময় এন সি সি-র সদস্য হওয়া ছিল ছাত্রদের জন্য আবশ্যিক। মাননীয় দুলালবাবু দীর্ঘকাল দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক হিসাবে অধ্যক্ষের দায়ভার পালন করেছেন। ইতিহাসের অধ্যাপক মাননীয় ব্রজেশচন্দ্র দাস মহাশয়ও এন. সি. সি.-র অফিসার ছিলেন। পরে তিনি ব্যাটেলিয়ানের দায়িত্বও গ্রহণ করেন।

প্রয়াত অধ্যক্ষ চিত্তপ্রিয় রায়ের সময়ে মহাবিদ্যালয়ে আমার কর্মজীবন শুরু হয়। কর্মজীবন শেষ না করেই তিনি মহাবিদ্যালয় ছেড়ে কলকাতায় চলে যান। ফলে মহাবিদ্যালয় পরিচালনার জন্য পরপর কয়েকজন বর্ষীয়ান অধ্যাপক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বেশ কয়েক বছর পর শ্রীযুক্ত সনৎ কুমার ব্যানার্জী অধ্যক্ষ হিসাবে মহাবিদ্যালয়ে যোগ দিলে পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়। তিনি অন্য মহাবিদ্যালয়ে চলে গেলে পুনরায় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব সামলান শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র মাল মহাশয়। এরপর ১৯৮৫-র আগষ্টে অধ্যক্ষ হয়ে আসেন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়। অধ্যক্ষ হিসাবে মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়নে তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। নেতাজীর এবং কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পালের মর্মরমূর্তি তাঁর সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাবিদ্যালয়ের নিজস্ব ছাপাখানা 'বর্ণমালা' এবং ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁর সময়ে চালু হয়। গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও পূর্বমুখী ভবনের দ্বিতলে স্থানান্তর তাঁর সময়েই ঘটেছে।

শ্রদ্ধেয় বিজয়বাবুর অবসর গ্রহণের পর ২০০৩-এর মার্চ মাসে ড. অসীম কুমার দে অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমশ মহাবিদ্যালয়ের প্রভূত উন্নতি সাধন করে চলেছেন।  ভবনগুলি সবই এখন ত্রিতল বিশিষ্ট ও লোভনীয় হয়েছে। সুন্দর জেনারেল অফিস, স্টাফরুম, ক্যান্টিন, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, গ্রন্থাগারের জন্য নিজস্ব ভবন ও সংলগ্ন সংগ্রহশালা, উন্নত পরীক্ষাগার, পর্যাপ্ত কম্পিউটার, স্মার্ট ক্লাসরুম, অফিসের উপরে অর্থাৎ তিনতলায় সুসজ্জিত প্রেক্ষাগৃহ, অতিথিনিবাস ছাড়াও খেলার মাঠের পূর্বদিকে পীচ রাস্তার পাশেই আরো একটি নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে। আশাকরি ২০২৩-এর ১ লা আগষ্টের আগেই এই ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন হবে।

আমাদের ছাত্রজীবনে হয়তো অভাব ছিল অনেক কিছুরই, কিন্তু অধ্যাপকদের স্নেহ-আন্তরিকতায় ভরপুর মনে তা কখনোই বড়ো হয়ে ওঠেনি। সেসময় ছাত্রসংসদ ছিল, কিন্তু কোনো অসন্তোষ বা আন্দোলন হয়নি। প্রতি বৎসর 'উৎসর্গ' পত্রিকা বের হতো ছাত্র এবং অধ্যাপকদের লেখাপত্র নিয়ে। নেতাজীর জন্মদিন ২৩শে জানুয়ারি উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে পালিত হতো। সরস্বতী পুজোও হতো বেশ ধুমধাম করে, যা এখনও চলে আসছে।

মহাবিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্পের সদস্যদের দ্বারা বৃক্ষরোপণ, বনসৃজন এবং মহাবিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ও নেতাজীর মূর্তির সামনে পুষ্পোদ্যান রচনার ফলে যেন এক তপোবনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

পরিশেষে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি - পূর্ণতার দিকে মহাবিদ্যালয়ের এই অভিযাত্রা সার্থক হোক। ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপকদের মধ্যে সম্পর্ক আরো মধুর হয়ে উঠুক - যাতে বিদ্যাফল উভয় পক্ষ সমভাবে লাভ করতে পারে। বিদ্যা লাভের সামর্থ উভয়পক্ষ পেতে পারে, লব্ধ বিদ্যা যেন সফল হয়, উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক কোনো বিদ্বেষ যেন না থাকে। উভয়পক্ষের ত্রিবিধ বিঘ্ন অপসারিত হোক।

"ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।"

# নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের পঁচাত্তর বছর ঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও পর্যালোচনা

ড. গোপালচন্দ্র সিনহা

## এক

মানবজাতির চরম লক্ষ্য হল জ্ঞান অর্জন করা। জ্ঞান বা শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত। কোনো জ্ঞানই বাহির হতে আসে না। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত উক্তি "Education is the manifestation of perfection already in man", অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতরে যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বর্তমান তারই প্রকাশ। এর সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ হল প্রাগৈতিহাসিক যুগের, আরো স্পষ্ট করে বললে প্রস্তর যুগ (Stone age)[১]-এর মানুষের অভাবনীয় প্রযুক্তিগত (Technological) জ্ঞানের উন্মেষ ও এর ক্রমবিকাশ। প্রসঙ্গত বলা যায় পুরাপ্রস্তর যুগের মানুষ পাথরের সঙ্গে পাথর ঘর্ষণ করে আগুন জ্বালানো, নানা ধরণের পাথরের হাতিয়ার, যেমন - হাত-কুঠার, ছেদক, কোপানি (একমুখি ও দ্বিমুখি), ব্লেড, ধারালো অস্ত্র প্রভৃতি নির্মাণ করে অবর্ণনীয় কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে বনের পশু শিকার করে, কখনো কাঁচা মাংস আবার কখনো কিছুটা আগুনে পুড়িয়ে, বনের ফলমুল সংগ্রহ করে এবং গুহায় বাস করে জীবন ধারণ করত। এরপর নব্যপ্রস্তর যুগে পাথরের হাতিয়ারকে আরো মসৃণ ও ধারালো করে কৃষিকাজ, পশুপালন, কুমোরের ভাটা তৈরি করে চাকে সুন্দর সুন্দর মৃৎশিল্প নির্মাণ, মাটির ঘরবাড়ি তৈরি অর্থাৎ গ্রামীণ জীবন এবং তারও পরবর্তীকালে প্রায় ঐতিহাসিক বা তাম্রপ্রস্তর যুগে অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতা (হরপ্পা সভ্যতা)-র আমলে[২] - নগর সভ্যতা (Urban Civilization)-র উন্মেষ ঘটে। এখানে যেটা লক্ষ্য করার বিষয় তা হল মানুষের এইসব অভাবনীয় উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডের পিছনে কোনো শিক্ষক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা ছিল না। অথচ পরিবর্তনগুলি ছিল বৈপ্লবিক।

পরবর্তীকালে সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজে নানা পরিবর্তন আসে। বলাবাহুল্য, মানুষকে বাদ দিয়ে সমাজ অকল্পনীয়। সমাজ ছাড়া ইতিহাস নেই। ইতিহাস গতিশীল ও প্রবহমান। তা চলে ঘড়ির কাঁটার মতো। সমাজও পরিবর্তনশীল - তা অনড়-অটল নয়। সমাজ চলে নিজস্ব গতিতে। সমাজের প্রয়োজনে যুগের পরিবর্তন আসে। একসময় সমাজে প্রচলিত যে ধারাকে স্বাভাবিক ও যুগোপযোগী বলে মনে হয়েছে, বেশ কিছুকাল বা কয়েক শত বছর পরে সেটাকেই মনে হয়েছে নেহাত গতানুগতিক। আসলে নিছক সময়ের পরিবর্তনই এর পিছনে কাজ করে না। বিজ্ঞান মনস্কতা ও যুক্তিবাদ প্রসূত চিন্তাধারা ঐ পরিবর্তনকামী ধারণার সৃষ্টি করে। সবচেয়ে বড় কথা হল সমকালীন যুগের প্রয়োজন ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই পরিবর্তন ঘটে। বিংশ শতকের মধ্যভাগে হুগলী জেলার আরামবাগ পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত কালিপুরে আমাদের প্রিয় নেতাজী

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

এই কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় ও প্রাক্কালে কালিপুরের ভৌগোলিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় হবে। আলোচ্য সময়কালে দ্বারকেশ্বর নদের পশ্চিমতীরে কালিপুর ছিল একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। আঢ্য, বল্লভ, নন্দী, কুণ্ডু প্রভৃতি পরিবারের বহু ধনবান ও সম্পদশালী মানুষ এখানে বাস করতেন। বাণিজ্যিক দিক থেকে এই জনপদটির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় রামকৃষ্ণ সেতু তৈরি হয়নি। তখন আরামবাগ শহরের সঙ্গে কলেজের সংযোগ স্থাপিত হত প্রধানত বাঁশের তৈরি একটি সেতুর মাধ্যমে। উল্লেখ্য, তখন বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি এলাকার বাসের শেষ স্টপেজ ছিল কালিপুর। তারপর বাঁশের তৈরি সেতু দিয়ে পৌঁছাতে হত আরামবাগ শহরে।[৩] বাণিজ্যিক দিক থেকে কালিপুরের পশ্চাদভূমি ছিল বেশ প্রশস্ত। তখন কালীপুরে গড়ে উঠেছিল বড় ধরণের বাজার। নানা মানুষের আগমণের ফলে কালিপুর হয়ে উঠেছিল জমজমাট। প্রধানত গোঘাট, কামারপুকুর, হাজীপুর, রামজীবনপুর, কোতুলপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নানাবিধ কৃষিজপণ্য বিশেষ করে ধান ও চাল কালিপুরে আসত চাষী ও ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে। দ্বারকেশ্বর (ধলকিশোর) ছিল তখন বেশ নাব্য। পণ্যবাহী নৌকা নৌপথে বহু দুর-দূরান্তে চলে যেত। শুধু কৃষিজ পণ্য নয়, কুটীর শিল্পের ক্ষেত্রেও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বিশেষ করে কালিপুরের দক্ষিণদিকে বালিদেওয়ানগঞ্জ এলাকা কাঁসা-পিতলের বাসন তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল এবং ঐ সমস্ত শিল্পপণ্য এখানে এসে পৌঁছাত। তবে রামকৃষ্ণ সেতু নির্মাণের পর বাণিজ্যিক দিক থেকে কালীপুরের গুরুত্ব ক্রমহ্রাসমান হতে থাকে - আরামবাগ শহরের গুরুত্ব বাড়তে থাকে।

## দুই

নেতাজী মহাবিদ্যালয় সংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ করার আগে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক এবং সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাধারার ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা সমীচিন হবে। কারণ সর্বভারতীয় আলোকে আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কোনো একক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

বস্তুত, বাংলা তথা ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনাধীনে অর্থাৎ ঔপনিবেশিক আমলে (১৭৬৫-১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ), বিশেষ করে ঊনবিংশ শতকে। এর আগেও ব্রিটিশ শাসনের সূচনা পর্বে হিন্দু ও মুসলিম ভারতবাসী যথাক্রমে পাঠশালা, টোল, মক্তব ও মাদ্রাসায় বাংলা, সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ভাষায় শিক্ষালাভ করত। বলাবাহুল্য, আধুনিক বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা সম্পর্কে তখন মানুষের কোনো ধারণাই ছিল না। প্রাচীন ও আদিমধ্য

যুগে ভারতবর্ষে বেশ কয়েকটি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিশ্ববিদ্যালয় / মহাবিহার)-এর অস্তিত্ব অবশ্য ছিল। এগুলি হল যথাক্রমে নালন্দা, তক্ষশিলা, বলভী, কাঞ্চীপুরম, মান্যখেতা, নাগার্জুনীকোণ্ডা, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা প্রভৃতি। কিন্তু এগুলি ছিল মূলতঃ বৌদ্ধধর্ম কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান - আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে এগুলির কোনো সম্পর্ক ছিল না। এছাড়া আজকের দিনের মতো এগুলির অধীনে কোনো কলেজ বা মহাবিদ্যালয় ছিল না। অপ্রিয় হলেও সত্যি যে, ভারতে বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ও প্রসার ঘটেছিল ইংরেজ ঔপনিবেশিক আমলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারের সূত্র ধরে।

বাংলা তথা ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা ও সম্প্রসারণে ঊনবিংশ শতক ছিল প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণযুগ। এই শতকের প্রায় প্রথম থেকেই একদিকে ইংরেজ প্রশাসক ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা এবং অপরদিকে বেশ কিছু বাঙালি মণীষি এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে সক্রিয় প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের রাধানগর গ্রামের অধিবাসী রামমোহন রায় (যিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'ভারতপথিক' নামে সুবিদিত)-এর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় হবে। তিনি যথার্থই অনুভব করেছিলেন আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার ওপর ভিত্তি করেই কুসংস্কার মুক্ত একটি নতুন ভারত গড়ে উঠবে, যা পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রধান সোপান হিসাবে কাজ করবে। তাই দেখা যায় ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজ ব্যয়ে কলকাতার শুঁড়িপাড়ায় 'এ্যাংলো হিন্দু স্কুল' নামে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরে 'ইন্ডিয়ান এ্যাকাডেমি' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। এছাড়াও বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে তিনি একটি চিঠি লেখেন, যাতে ভারতবর্ষে গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, অস্থিবিদ্যা, পাশ্চাত্য দর্শন ও ইংরাজী শিক্ষার দাবি জানানো হয়। তাঁর লেখা এই চিঠিটি ভারতীয় নবজাগরণের ইতিহাসে একটি মূল্যবান দলিল হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। তাঁর সমকালীন যুগেই ডেভিড হেয়ার, রাধাকান্ত দেব প্রমুখদের উদ্যোগে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় 'হিন্দু কলেজ' (পরে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে নাম হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ)। খ্রিস্টান মিশনারীদের তরফেও ঊনবিংশ শতকের প্রথম তিন দশকে শুধু বাংলায় নয়, বোম্বাই ও মাদ্রাজ মিলে মোট প্রায় দুই শতাধিক পাশ্চাত্য শিক্ষার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলিতে প্রধানত খ্রিস্টান ধর্ম সংক্রান্ত শিক্ষা দেওয়া হলেও ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হত।

ঊনিশ শতকের তিন-এর দশক থেকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রাচ্যবাদী (Orientalist) ও পাশ্চাত্যবাদী (Anglicist)-দের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। আমাদের চিরাচরিত দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংঘর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষেই রায় দেন বেশিরভাগ ইংরেজ প্রশাসক ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (১৮২৮-১৮৩৫)

এবং তাঁর আইনসচিব টমাস ব্যাবিংটন মেকলে। বেন্টিঙ্ক ইংরাজী শিক্ষাকে সরকারি নীতিরূপে ঘোষণা করেন ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মার্চ এবং ঐ বছরেই প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা মেডিকেল কলেজ। এরপর ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে সরকারি চাকরি পেতে গেলে ইংরাজী ভাষাজ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করলে মধ্যবিত্ত সমাজে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। বলা বাহুল্য, এই ঘোষণা প্রাচ্যবাদী তথা দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর প্রবল আঘাত হানে।

অতঃপর গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসীর আমলে (১৮৪৮-১৮৫৬) দেশীয় রাজ্য আগ্রাসনের ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর নীতি অনুসৃত হওয়া সত্ত্বেও দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পক্ষে কিছু ইতিবাচক প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে জুলাই বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড একটি নির্দেশনামা জারী করেন, যার ওপর ভিত্তি করেই প্রধানত আধুনিক ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই নির্দেশনামায় ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক আমলে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানে সর্বপ্রথম সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয় এবং বলা হয় প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। আসলে বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দেশীয় ভাষাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া এই নির্দেশনামাতেই 'গ্রান্ট-ইন-এড' প্রথার মাধ্যমে উচ্চবিদ্যালয়, কলেজ বা মহাবিদ্যালয় স্থাপন এবং ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সি শহর যথা কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। এই সুপারিশ কার্যকরী করা হয় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার মাধ্যম হয় ইংরাজী ভাষা। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই ডেসপ্যাচেই প্রথম সরকারি ভাবে নারী শিক্ষার প্রসারের ওপর জোর দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এর ওপর ভিত্তি করেই Director of Public Instruction (পরবর্তীকালে Council of Education)-এর সদস্য (পরে বাংলার ছোটলাট) ফ্রেডারিক জন হ্যালিডে তাঁর প্রিয়পাত্র তৎকালীন হুগলী জেলার বীরসিংহ গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় (কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ)-কে বাংলার আদর্শ বিদ্যালয়গুলি (Model School)-র প্রধান তত্ত্বাবধায়ক এবং দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয়সমূহের সরকারি ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের মধ্যেই নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় বিদ্যাসাগর শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষায় বেশকিছু আদর্শ বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু এই অঞ্চলে তখন মহাবিদ্যালয় তথা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়নি। তবে বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় (১৮২০-১৮৯১) আমাদের কাছাকাছি এলাকা বলতে বর্ধমান শহরে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'বর্ধমান রাজ কলেজ'।

এইভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংঘর্ষে ভারতবাসীর চিন্তা ও চেতনার জগতে এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। প্রাচ্যের চিরাচরিত প্রথা, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের পরিবর্তে

যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও বিজ্ঞান মনস্কতার প্রাধান্য ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। পাশ্চাত্যের শিক্ষার প্রতি মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। বাংলা থেকেই ক্রমশ ভারতীয় নবজাগরণের উন্মেষ ঘটে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, উচ্চশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের মধ্যে ছিল দুস্তর পার্থক্য। উচ্চশিক্ষা লাভ অনেকটাই সীমিত হয়ে পড়েছিল শহরাঞ্চলের মধ্যে। গ্রামগুলি ছিল তুলনায় অনেক পিছিয়ে। গ্রামাঞ্চলের স্বল্প কিছু ছাত্র, যাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল, কেবল তারাই শহরাঞ্চলে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হত। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাদপর এলাকাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় অবশ্যই ছিল, তবে প্রয়োজনের তুলনায় সেগুলিও ছিল খুবই অপ্রতুল।

## তিন

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহের আঘাতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কেম্পানির শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতবর্ষকে সরাসরি ব্রিটিশ রাজশক্তি (Crown)-র শাসনাধীনে আনা হয় ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের আইনের মাধ্যমে। এর সূত্র ধরে ভারতে একদিকে যেমন ঔপনিবেশিক শাসনকে দৃঢ় ও মজবুত করে তোলার চেষ্টা নেওয়া হয়, অপরদিকে তেমনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একটি রাষ্ট্রীয় ঐক্য গড়ে ওঠে - অখণ্ড ভারতবোধ জাগ্রত হয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। এর পিছনে নিশ্চিতভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত উনিশ শতকের নবজাগরণের অবদান ছিল।

ভারতবর্ষে ১৮৫৮ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজের শাসন যেমন বলবৎ ছিল, তেমনি ঐ শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার জন্য কখনো আঞ্চলিক ভিত্তিতে আবার কখনো সর্বভারতীয় স্তরে নানা ধরণের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলে ব্রিটিশ শাসনকে উচ্ছেদ করতে এদেশের মানুষ মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলিম সংগঠন বিশেষ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) এবং মুসলিম লীগ (১৯০৬) পৃথক পৃথক ভাবে (কোনো কোনো সময় অবশ্য ঐক্যবদ্ধভাবে) আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। মাঝে মাঝে হয়তো উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মতদ্বৈততা প্রকট হয়েছিল, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সরকারের কোনো না কোনো জনবিরোধী নীতি সমকালীন নেতৃবৃন্দকে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উত্তাল হয়ে উঠতে বাধ্য করেছিল। এ প্রসঙ্গে অহিংস ও খিলাফত আন্দোলন (১৯২০-২২), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩৪) এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২)-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই আন্দোলনগুলির সঙ্গে সর্বভারতীয় স্তরে অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী (পুরুষ ও নারী) সহ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতি জটিল হয়ে ওঠে। জার্মানীর নাৎসী নেতা হিটলারের পোল্যান্ড আক্রমণ (১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)-এর সূত্র ধরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) জনিত আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘোলাজলে জাতীয় কংগ্রেসের বামপন্থী সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত ফরোয়ার্ড ব্লক দল (৩মে, ১৯৩৯)-এর প্রতিষ্ঠাতা, অভাবনীয় দূরদৃষ্টির অধিকারী, দেশনায়ক ও সর্বোপরি আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের বাইরে থেকে ব্রিটিশ শক্তি তথা মিত্র শক্তিবর্গের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টির জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠেন। উদ্দেশ্য ছিল, আন্তর্জাতিক সংকটকে কাজে লাগিয়ে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করা। এই মহৎ পরিকল্পনাকে সামনে রেখে ১৯৪১-এর ১৭ জানুয়ারি কলকাতার বাসভবনে অন্তরীণ অবস্থা থেকে ছদ্মবেশে দেশত্যাগ করে যথাক্রমে কাবুল, মস্কো, জার্মানী হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৩-এর জুন মাসে জাপানের টোকিও শহরে পৌঁছান। সিঙ্গাপুরে অন্যতম বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে তাঁর এ ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা হয়। আগষ্ট মাসে তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পান এবং এর কিছুদিন আগেই সিঙ্গাপুরে উপস্থিত ভারতীয়গণ কর্তৃক তিনি 'নেতাজী' নামে আখ্যায়িত হন।

এরপর ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২১শে অক্টোবর অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য তিনি সশস্ত্র সংগ্রামের লক্ষ্যে সক্রিয় পদক্ষেপ নেন। জার্মানী, ইতালি, জাপান তথা অক্ষশক্তি জোটের সঙ্গে সাময়িক গাঁটছাড়া বেঁধে ব্রিটিশ সরকারকে তিনি কঠিন চাপের মধ্যে ফেলেছিলেন। স্বাধীন ভারত তিনি দেখে যাননি ঠিকই, তবে আন্দামান (শহীদ দ্বীপ) ও নিকোবর (স্বরাজ দ্বীপ) ও ইম্ফল-এ ১৯৪৩-এর ডিসেম্বর ও ১৯৪৪-এর গোড়ায় তিনি স্বাধীনতার যে অঙ্কুর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, উদ্ভুত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তা আপাতত অসফল হলেও তাঁর তথা আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সমকালীন যুগেই নয়, চিরকাল ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর বিখ্যাত উক্তি, ''আমরা পরাধীন হইয়া জন্মিয়াছি একথা সত্য, কিন্তু স্বাধীন দেশে মরিব, দেশকে মুক্ত করিয়া মরিব ... আর যদি জীবনে মুক্ত ভারতবর্ষের রূপ দেখিতে না পারি, তবে যেন ভারতবর্ষকে মুক্ত করিতে জীবন বিসর্জন করিতে পারি।''[৩৫] তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী যে কতখানি সত্য তা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন প্রত্যেক ভারতবাসী। শুধু ২৩ জানুয়ারী নয়, প্রত্যেকদিন, প্রতিটি ভারতবাসীর মনের মণিকোঠায় তিনি বিরাজমান। তাঁর কর্মকাণ্ড ও অন্তর্ধান নিয়ে গবেষণা নিরন্তর চলছে ও চলবে।

## চার

ব্রিটিশ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে ভারতের মুক্তিলাভ (১৫ আগষ্ট, ১৯৪৭)-এর সূত্র ধরে শুধু আরামবাগ বা পশ্চিমবঙ্গ নয়, ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষের সামগ্রিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। তবে দুঃখজনক

ঘটনা হল ব্রিটিশ রাজের অবসান ঘটার সাথে সাথে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে নয়, উদ্ভুত রাজনীতির দুষ্ট চক্রজালে মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগের অখণ্ড ভারত দ্বিখণ্ডিত হল। একটির নাম হল ভারত এবং অপরটি পরিচিত হল পাকিস্তান নামে। দুটিই স্বাধীন রাষ্ট্র বলে পরিগণিত হল।

স্বাধীন ভারতের প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লক দলের প্রতিষ্ঠাতা ও ভারতে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বীর নায়ক ও দেশপ্রেমিক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নাম মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে লাগল। সেই সময় ও পরবর্তীকালে তাঁর নামানুসারে বিভিন্ন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। আমাদের গর্বের বিষয় হল স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে 'নেতাজী' নামাঙ্কিত প্রথম কলেজ হল আরামবাগ শহর সংলগ্ন নেতাজী মহাবিদ্যালয়। এছাড়া, আরামবাগ মহকুমার মধ্যে এটাই ছিল প্রথম কলেজ বা মহাবিদ্যালয়।

বর্তমান আরামবাগ পৌরসভার ১৮ নং ওয়ার্ডে দ্বারকেশ্বর নদের পশ্চিম তীরে কালিপুর গ্রামে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১লা আগষ্ট আজকের নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ঘটে। উল্লেখ্য, সেইসময় আজকের কলেজ ক্যাম্পাস ছিল বনজঙ্গলে ভর্তি। অঙ্কের নিয়মে এটি পঁচাত্তর বৎসর উত্তীর্ণ হতে চলল। কেতাবী ভাষায় এটি 'প্লাটিনাম জুবিলি' (অমৃত মহোৎসব) বর্ষ। কোন্ পটভূমিতে, কে বা কারা এই মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিলেন, এই মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে 'নেতাজী'র নাম জড়িত হল কেন, সেসব বিষয়ে কৌতূহল জাগা খুব স্বাভাবিক। যতদূর সম্ভব বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া তথ্য (লিখিত ও মৌখিক)-র আলোকে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা বাঞ্ছনীয় হবে।

পূর্ববর্তী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা সম্ভব হয়েছে যে ভারতবর্ষে শাসনরত ব্রিটিশ শাসকদের সময় থেকে এদেশে ধীরে ধীরে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল - সংখ্যায় কম হলেও বিভিন্ন প্রান্তে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারত স্বাধীন হবার পর উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার ডঃ রাধাকৃষ্ণানের নেতৃত্বে গঠন করেন প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন। সেই অনুকূল পরিবেশকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন হয় উপযুক্ত, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, যোগ্য এবং অবশ্যই কূটনৈতিক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের। এরসঙ্গে অবশ্যই প্রয়োজন ছিল আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সেবাপরায়নমূলক মনোভাব। উল্লেখ্য, এই সময় দেশের শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজে ভারতের সর্বত্র স্থানীয় ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনে স্বাধীনতা সংগ্রামী, দেশপ্রেমিক ও মানবদরদী মানুষ এগিয়ে এসেছিলেন। এক্ষেত্রে হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমাও পিছিয়ে ছিল না।

এই অঞ্চলের মানুষের সৌভাগ্য যে, প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব থেকেই রাজনীতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত

গোঘাট থানার রঘুবাটি ইউনিয়নের রতনপুর গ্রামের স্বনামধন্য ব্যক্তি স্বর্গীয় ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল এই অঞ্চলে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর এই ধারণা দৃঢ় হয়েছিল যে, এই অঞ্চলের সাধারণ কৃষক ও দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভ না করলে স্বাধীন ভারতবর্ষের নতুন নতুন বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা লাভ থেকে বঞ্চিত হবে। এ প্রসঙ্গে একটি বাস্তব ঘটনা তুলে ধরলে বিষয়টি বোঝা সহজসাধ্য হবে। নেতাজী মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তৃতীয় ব্যাচের (১৯৫০-৫২) ছাত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন কুণ্ডুর কাছে কয়েক মাস আগে আমার শোনা এবং তাঁর চাক্ষুষ দেখা ও নিজ কানে শোনা একটি ঘটনা এখানে তুলে ধরলাম। সময়কাল ১৯৪৫-১৯৪৬ সাল। ব্রজমোহনবাবুর ভাষায়, "আমার কাকা গোবিন্দচন্দ্র কুণ্ডুর দোকানে একদিন সকালের দিকে এসে ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল বলেছিলেন, গোবিন্দদা, ..... কালিপুরে কলেজ করবো, আশীর্বাদ করো। নদীর ধারে তোমার তিন পাঁজা ইটের মধ্যে এক পাঁজা দিতে হবে ঘর করার জন্য। গোবিন্দবাবু এতে সম্মতি দিয়েছিলেন এবং বিরুদ্ধ দলের মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন"। এলাকার শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নয়নের পাশাপাশি ডাঃ পালের মানবদরদী মনোভাবের আরো একটি তথ্য পেলাম ব্রজমোহনবাবুর সঙ্গে কথোপকথন থেকে। তিনি জানালেন, কাকাকে কথা প্রসঙ্গে ডাঃ পাল বলেছিলেন, এখানে কলেজ হলে ছেলেমেয়েরা মুড়ি, পান্তাভাত খেয়েও কলেজে পড়তে পারবে। অর্থের অভাবে অনেক বাবা-মা তাঁদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য দূরে পাঠাতে পারেন না। এখানে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা হল, প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে ১৯৩০-এর দশক থেকে বেঙ্গাই, গোবিন্দপুর, মান্দারণ ও সংলগ্ন এলাকায় বেশকিছু প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করে ১৯৪৬ সাল থেকেই তিনি কালিপুর এলাকায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হয়ে ওঠেন। দেশ স্বাধীন হবার পর এই প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত হয়।

বস্তুত, কোনো ব্যক্তিস্বার্থ নয়, স্থানীয় মানুষের প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধার কথা ভেবে নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উদার মনোভাবাপন্ন ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল এই অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার প্রসারে অগ্রণী হয়েছিলেন। পেশায় ডাক্তার (তৎকালীন এল. এম. এফ. ডিগ্রি) হলেও তাঁর নেশা ছিল রাজনীতি ও সমাজসেবা। তাঁর মধ্যে ছিল অসীম ধৈর্য, নিষ্ঠা এবং অভাবনীয় জেদ। সবরকমের প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অবলীলায় অতিক্রম করে প্রয়োজনে ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় নিয়েও তিনি মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে গৃহীত সিদ্ধান্তকে যে কোনো রূপে বাস্তবায়িত করতেনই।[৪] এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল কালিপুর গ্রামে এই মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। প্রসঙ্গত বলা যায় স্বাধীনোত্তর পর্বে মহকুমার প্রথম কলেজটি কোথায় প্রতিষ্ঠিত হবে, দ্বারকেশ্বর নদের পূর্বপাড়ে আরামবাগ শহরে নাকি এর পশ্চিমপাড়ে কালিপুরে - সে বিষয়ে এই সময় একটা সংঘাত শুরু হয়েছিল।[৫] একদিকে ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন (আরামবাগের গান্ধী) ও তাঁর অনুগামীরা। বিশেষ করে অতুল্য ঘোষ ও বলাইকৃষ্ণ রায়, যাঁরা আরামবাগ শহরে কলেজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে

ছিলেন। এই ব্যাপারে আরামবাগ রাজা রামমোহন হলে একটি কনভেনশনের মধ্যে দিয়ে আরামবাগে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়।[৬] অপরদিকে ছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লক দলের প্রতিষ্ঠাতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কর্মধারার একান্ত অনুরাগী ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল এবং তাঁর অসংখ্য অনুগামী যথা সত্যেন্দ্রনারায়ণ আঢ্য (আরামবাগ পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও প্রথিতযশা উকিল), পান্নালাল আঢ্য (কোর্টের মোক্তার), গঙ্গাধর আঢ্য, অমর আঢ্য, রাধামাধব কুণ্ডু, শৈলেশ্বর পাল (প্রথিতযশা উকিল), কালীপদ দত্ত, ষষ্ঠীচরণ দত্ত, শরৎচন্দ্র বাড়ুই, বিভূতি বাগ, ইন্দ্রনারায়ণ নন্দী, প্রসাদ বল্লভ, কালী মুখার্জী প্রমুখ। এঁরা সকলেই আজ প্রয়াত। এঁরা ছাড়াও ছিলেন আরো কিছু শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি যথা - ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ফকিরচন্দ্র পাল, পঞ্চানন মণ্ডল, আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ও সত্যকুমার মণ্ডল যাঁরা কালিপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন। এঁরাও আজ ইহলোকে নেই। যাইহোক, উভয় পক্ষের মধ্যে এই 'স্নায়ুযুদ্ধে' শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিলেন স্বর্গীয় ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল ও তাঁর অনুগামীরা। বাকি ছিল কালিপুরে কলেজ স্থাপনের সরকারি অনুমোদন লাভ।

কালিপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল ঐ এলাকায় জমি ও জায়গা। প্রসঙ্গত বলা যায় এক্ষেত্রে ডাক্তার পাল আক্ষরিক অর্থে ছিলেন নিঃস্ব। কারণ এখানে তাঁর কোনো জমি-জায়গা ছিল না। কিন্তু তাঁর যা ছিল তা হল ইতিবাচক কাজে অপরিসীম জেদ, মনোবল ও সৎ সাহস, সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মেশার অভাবনীয় দক্ষতা এবং মানুষের হৃদয় জয় করার অফুরন্ত শক্তি। জানি না স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর গুরুভাইরা (রামকৃষ্ণের ফৌজ) কেবল একাগ্রতা ও ঈশ্বরের আশীর্বাদের ওপর নির্ভর করে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল আগে রিক্ত ও নিঃস্ব অবস্থায় বেলুড়ে যে রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপনের (১৮৯৭) মতো বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন তার কোনো অনুপ্রেরণা ডাঃ পালের ওপর পড়েছিল কিনা। প্রসঙ্গত বলা যায় কৈশোর জীবনে তিনি প্রায়ই শ্রী শ্রী সারদা মায়ের জন্মস্থান জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরে যেতেন ও মাঝে মাঝে থাকতেন।

বলা বাহুল্য, ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত থেকে কলেজ বা মহাবিদ্যালয়ের মতো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যতটা সহজ, ক্ষমতায় না থেকে ঐ কাজে সাফল্য লাভ করা ঠিক ততটাই কঠিন। তবে শোনা যায় যে, কালিপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরোক্ষ সমর্থন ছিল। এ ব্যাপারে অবশ্য বিতর্ক থাকতে পারে। এখন কালিপুরে বর্তমানে যেখানে নেতাজী মহাবিদ্যালয় অধিষ্ঠিত রয়েছে সেখানের এই বিশাল এলাকা তিনি কিভাবে সংগ্রহ করলেন এবং কারাই বা তাঁকে কলেজ তৈরির জন্য জমি-জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলেন সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যাক, নতুবা প্রকৃত ইতিহাসকে অস্বীকার করা হবে। প্রসঙ্গত বলি, আমি ব্যক্তিগতভাবে এই এলাকার মানুষ নই এবং সেই সময় আমার জন্মও হয়নি। এ ব্যাপারে লিখিত সরকারি তথ্যও আমি সেভাবে পাইনি। স্বাভাবিক ভাবেই কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় ও প্রাক্কালে আরামবাগ এলাকার যে

সমস্ত মানুষ এখনও জীবিত আছেন অথবা অল্প কিছুকাল আগে প্রয়াত হয়েছেন, যাঁরা স্বর্গীয় ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল, তাঁর সহযোগিগণ এবং অবশ্যই বর্তমান কলেজ ভবন ও সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের কমবেশি চিনতেন, তাঁদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মৌখিক তথ্য এবং স্বল্প কিছু লিখিত প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশের উপর নির্ভর করে এই বিষয়টি লেখার চেষ্টা করলাম। এঁরা হলেন যথাক্রমে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন কুণ্ডু, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মেদ্দা, প্রয়াত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, প্রাক্তন অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র মাল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রণজিৎ কুমার গোস্বামী, শ্রীযুক্ত স্বপন কুমার লাহা প্রমুখ। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় ব্রজমোহন কুণ্ডুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও তাঁর একটি প্রবন্ধের দু-তিনটি লাইন উল্লেখ করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। তাঁর কাছ থেকে জানা যায় যে, বর্তমান কলেজ সংলগ্ন এলাকায় মাননীয় শরৎচন্দ্র বাড়ুই, বিভূতি বাগ, ইন্দ্রনারায়ণ নন্দী, প্রসাদ বল্লভ ও আরো অনেকে বসবাস করতেন। এছাড়া আঢ্য, বাড়ুই, নন্দী, বল্লভ ও কুণ্ডু প্রমুখ পরিবারের বেশ কিছু জমি-জায়গা ঐ এলাকায় ছিল। ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল তাঁর সুমধুর ব্যবহার ও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্যের মাধ্যমে ঐ জমি-জায়গাগুলি তাঁদের কাছ থেকে কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। উল্লেখ্য, সংকটকালে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার অসাধারণ দক্ষতা তাঁর ছিল। এছাড়া ঐ এলাকায় বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদের যে সমস্ত জমি ছিল সেগুলিও তিনি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দান করেন। এইভাবে অল্পদিনের মধ্যেই জায়গা সংগ্রহ করে কালিপুরেই কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হল। ১৯৪৮ সালেই সরকার কালিপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিলেন। ডাঃ পালের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা এইভাবে সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছাল। এ প্রসঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিখ্যাত উক্তি স্মরণীয় এবং তা হল - 'আদর্শের চরণে যে আত্মসমর্পণ করতে পারে সেই কেবল জীবনের অর্থ বুঝতে পারে এবং জীবনের অন্তর্নিহিত রসের সন্ধান পেতে পারে'। (তরুণের স্বপ্ন, পৃঃ১৫)

এরপর প্রাথমিক যে সমস্যা ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে প্রবল উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াল, তা হল জায়গা পাওয়া গেল, সরকারি অনুমোদন মিলল - কিন্তু ১৯৪৮ সালেই কলেজ শুরুর জন্য এই এলাকায় ঘর পাওয়া যাবে কোথায়? কথায় আছে 'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়', 'আন্তরিক চেষ্টা থাকলে ঈশ্বর সহায় হন'। এক্ষেত্রেও তাই ঘটল। আমাদের স্মরণে রাখা দরকার যে, চালক গাড়ি চালান ঠিকই কিন্তু চাকা না থাকলে গাড়ি চালানোর কথা ভাবাই যায় না। যেটা বলতে চাইছি, তা হল স্বর্গীয় ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল নিশ্চিতভাবে এই কলেজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ও কাণ্ডারী। কিন্তু তাঁর এই মহত্তম কাজে আন্তরিকভাবে এগিয়ে এসেছিলেন অনেক নিঃস্বার্থ উদারমনা ব্যক্তি, যাঁদের নাম ওপরে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের যোগ্য সহায়তা ছাড়া কলেজের প্রতিষ্ঠা ঘটানো ছিল খুবই কঠিন। এখানে কলেজের সূচনাপর্বে যাঁরা নিজেদের বাসভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়ে সেই বাসভূমি কলেজের ক্লাস করার জন্য সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে

দিয়েছিলেন তাঁদের কথা না বললে সত্যের প্রতি অবিচার করা হবে। উল্লেখ্য, দ্বারকেশ্বর নদের পশ্চিমতীরে কালিপুরের বকুলতলায় সত্যেন্দ্রনারায়ণ আঢ্য, পান্নালাল আঢ্য সপরিবারে সুখী জীবন যাপন করছিলেন সুদীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু ডাক্তার পালের এই মহৎ উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে সমর্থন জানিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কলেজ চালু করার জন্য নিজ গৃহ (গোশালা সহ) ত্যাগ করে সপরিবারে আরামবাগ শহরে তাঁদের নিকট আত্মীয় শ্রীযুক্ত কালীপদ দত্তের বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করেন। যতদিন না কলেজের নিজস্ব ঘরবাড়ি তৈরি হয় ততদিন তাঁরা সেখানেই বাস করেছিলেন। তাই কলেজের ইতিহাসে আঢ্য পরিবারের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এক্ষেত্রে শুধু আঢ্যদের উদার হৃদয়ের পরিচয়ই পাওয়া যায় না - শ্রীযুক্ত কালীপদ দত্ত মহাশয় ও বিশেষ করে তাঁর পরিবারের অভূতপূর্ব স্বার্থত্যাগের বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। উল্লেখ্য, রতনপুর গ্রাম থেকে কালীপুরে কলেজ স্থাপনের কাজ দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান করার জন্য ডাঃ পাল তাঁর কাছের মানুষ স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বাড়ুই-এর সহযোগিতায় এই এলাকায় রাত্রি বাসের জন্য একটি কুঁড়ে ঘর তৈরি করে সেখানে থাকতেন। এই তথ্যটি পেলাম শ্রদ্ধেয় ব্রজমোহন কুণ্ডুর কাছ থেকে কয়েকদিন আগে সাক্ষাতের সময়। এখানে আরো উল্লেখ করা যায় যে, তৎকালীন যুগে প্রত্যন্ত গ্রামের কলেজে পড়তে গেলে দূর দূরান্তের ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাসের প্রয়োজন ছিল অনস্বীকার্য। এই সমস্যাটির তাৎক্ষণিক সমাধান করেছিলেন আরামবাগের অধিবাসী ও খ্যাতনামা আইনজীবি স্বর্গীয় ফকিরচন্দ্র পাল মহাশয়। তিনি নিজের ক্ষতি স্বীকার করে তাঁর সুরম্য বাড়িটি ছাত্রাবাসের উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে দান করেছিলেন - যা ইতিহাসে প্রায় বিরল। নাম ধরে স্বীকার করা হল না সেই সমস্ত অসহায়, গরীব, দরদী ও নিঃস্বার্থ মানুষদের যাঁরা কোনো না কোনো ভাবে এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় প্রাণপণ পরিশ্রম করেছিলেন ও কিছু না কিছু সাহায্য করেছিলেন। তাঁদের নাম ইতিহাসের পাতায় নেই, তাঁরা 'চিরকাল টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল', আধুনিক ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক তাঁরা 'Subaltern' বা 'নিম্নবর্গীয়' বলে পরিচিত। নাম না জানা সেইসব অসংখ্য ব্যক্তিদের জানাই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।

কলেজের নাম কেন 'নেতাজী'র নামে হল সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করার চেষ্টা করছি। ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করে ডাঃ পাল জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে নামেন। প্রথম থেকেই তিনি সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শ ও কর্মকাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র সুভাষচন্দ্র বসুকে আরামবাগে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন এবং এখানে একটি জনসভা করেন।[৭] এরপর ১৯৩৯-এর ৩ মে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে কংগ্রেসের বামপন্থী সদস্যদের নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন করলে ডাঃ পাল তাঁর অনুগামীদের নিয়ে ঐ দলে যোগ দেন এবং সুভাষচন্দ্র বসুর আরো ঘনিষ্ঠ ও স্নেহধন্য হয়ে ওঠেন। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার আরো প্রমাণ মেলে

১৯৩০-এর দশকে ভারতবর্ষের বাইরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রেরিত সুভাষচন্দ্র বসু ও ডাঃ পালের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ চিঠি আদান প্রদানের মধ্যে।[৮] ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধকালীন সময়ে (১৯৩৯-১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ) ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর কথা প্রচারিত হয়। পরবর্তীকালে স্বাধীনোত্তর ভারতের গোড়ার দিকে ১৯৪৮ সালে কালিপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল 'নেতাজী' নামটাই গ্রহণ করেন তাঁর বিরল কর্মকাণ্ডের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবশতঃ।

এই মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা বলে নেওয়া সমীচিন হবে। বিষয়টি মূলতঃ কলেজ প্রতিষ্ঠার মাস খানেক আগে ডাঃ পাল যে নানা সমস্যার মধ্যে পড়ে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন তার একটি লিখিত প্রমাণ। প্রসঙ্গত বলা যায় নেতাজীর অবর্তমানে তাঁর দাদা স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসু ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন যার প্রমাণ মেলে কলকাতার উডবার্ন পার্ক থেকে ০৭/০৭/১৯৪৮ তারিখে ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পালকে লেখা শরৎবাবুর একটি চিঠি থেকে। চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত হল - ''রাধাকৃষ্ণ, বোম্বাই হইতে ফিরিয়া তোমার দুখানি চিঠিই পাইয়াছি। ... কলেজ লইয়া তুমি খুব অসুবিধায় পড়িয়াছ বুঝিতে পারিতেছি। কোন মহৎ কাজই সহজে সম্পন্ন করা যায় না। আমার বিশ্বাস তোমার আন্তরিকতা ও অক্লান্ত চেষ্টা কখনও নিরর্থক হইবে না। কলেজ সম্পর্কে তোমার কাজ কতদূর অগ্রসর হইল জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছি।''[৯]

এইভাবে নানা প্রতিকূল পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে এনে শেষ পর্যন্ত ডাঃ পাল এক্ষেত্রে সফল হন। উল্লেখ্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্বর্গীয় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সহযোগিতায় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আরামবাগ শহর সংলগ্ন কালিপুরে সত্যেন্দ্রনারায়ণ আঢ্যর বকুলতলার বাড়িতে ১৯৪৮-এর ১ আগষ্ট স্থাপিত হল 'নেতাজী মহাবিদ্যালয়'। উল্লেখ্য, ঐ বছর আই. এ., আই. কম. ও আই. এস. সি. অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট কোর্সের তিনটি শাখার অনুমোদন পাওয়া গিয়েছিল। আরামবাগের অভিনয় জগতের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত কালীপদ বেজ মহাশয় আঢ্যদের বাড়িতে কলেজের প্রবেশপথে সুন্দর হস্তাক্ষরে 'নেতাজী মহাবিদ্যালয়, আরামবাগ, স্থাপিত ১৯৪৮' কথাগুলি বড় হরফে লিখেছিলেন। উল্লেখ্য, আরামবাগের পুরাতন বাজারে তাঁর ঘড়ি সারানোর একটি দোকানও ছিল।

১৯৪৮ সালের ১লা আগষ্ট নেতাজী মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হল। প্রতিষ্ঠার পরে পরেই একটি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছিল ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পালের উদ্যোগে।[১০] এই প্রচার পুস্তিকাটির প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে ধরা হল ঃ

'' আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয় (শুভ উদ্বোধন) সম্পন্ন। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজীর পৌরোহিত্যে আরামবাগে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। সভায় সুভাষ নগরের প্রতিষ্ঠাতা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর স্নেহধন্য ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল, অধ্যাপক বিমল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অনিলকৃষ্ণ রায়, দুর্গা চক্রবর্তী প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।"

"... বর্তমান আরামবাগ আজ ভাগ্য বিবর্তনে অশিক্ষায়-কুশিক্ষায় ও নানা কুসংস্কারে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে লুপ্ত হতে বসেছে। তাই মরণোন্মুখ আরামবাগের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও ভবিষ্যৎ উন্নতি মানসে আরামবাগ সম্মিলনী গঠন করা হয়েছে। শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য এই বৎসর নেতাজী মহাবিদ্যালয় নামে আধুনিক বিজ্ঞান সম্ভারে আরামবাগে দ্বারকেশ্বর নদের তীরে 'আঢ্য' ভবনে একটি আদর্শ কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য আই. এ., আই. কম., আই. এস. সি. ক্লাসসমূহ এই বৎসর খোলা হল। ... আজ সহৃদয় দেশবাসীর নিকট প্রার্থনা তাঁরা সর্বতোভাবে সাহায্য করে এই শুভ প্রতিষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করুন।"

নিবেদক

বিনীত-

ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (সভাপতি) ও কোষাধ্যক্ষ ডাঃ হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জায়গার অভাবে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের ক্লাস হত দিনের বেলায়, বাণিজ্য বিভাগের ক্লাস হত সন্ধ্যায়। কলেজ প্রতিষ্ঠা ও প্রারম্ভিক পর্বে সামগ্রিকভাবে কলেজ পরিচালনার জন্য যে বিশাল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল, তার সমাধানের জন্য পার্শ্ববর্তী বহু সাধারণ মানুষ, ব্যবসাদার ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অকৃপণ ও আন্তরিক সাহায্য তিনি পেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে প্রধান হাতিয়ার ছিল ডাঃ পালের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সুকৌশল ও বাকচাতুর্য। স্থানীয় মানুষজন ছাড়াও এই ধরণের মহৎ কাজে তিনি কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের উদার মনোভাবাপন্ন মানুষের প্রাণভরা ভালোবাসা ও অর্থনৈতিক সাহায্য লাভ করেছিলেন। একটি তথ্যসূত্র থেকে প্রাপ্ত অর্থপ্রদানকারী ব্যক্তিদের একটি তালিকা এখানে উল্লেখ করা হল। তালিকাটি হল - উত্তরপাড়ার জমিদার পরিবারের মুখার্জীবাবুরা, রতনপুর গ্রামের মানুষ ও পরে কলকাতায় গড়চা রোডের ব্যবসায়ী দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বরূপা থিয়েটারের মালিক রাসবিহারী সরকার, কলেজ স্ট্রীটের গ্লোব নার্শারির মালিক, কলেজ স্ট্রীটের শশীপদ-প্রভাপদ বাসনের দোকানের মালিক, কলেজ স্ট্রীটেরই ব্যবসায়ী রায় এণ্ড ব্রাদার্স এবং সর্বোপরি কলকাতার বড় বাজারের মেটেল মার্কেটের ব্যবসায়ীগণ। এরকম শোনা যায় যে, প্রারম্ভিক পর্বে অধ্যাপকদের মাইনে যোগাতেন ঐ মেটেল মার্কেটের ব্যবসায়ীরা।[১১]

## পাঁচ

১৯৪৮ সালে অর্থাৎ কলেজ শুরুর বছরেই ছাত্রসংখ্যা আশানুরূপ হয়নি। একটি তথ্যসূত্র থেকে জানা যায়, কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগে মোট ছাত্র ছিল ৯৩ জন।[১২] প্রথমেই অর্থাৎ আগস্ট মাসে অধ্যক্ষের পদ

শূন্য ছিল। অধ্যাপক অনিলবরণ রায় তখন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। উল্লেখ্য কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে পরেই আগষ্ট মাসের গোড়ায় ডাঃ পাল কমসংখ্যক ছাত্র ভর্তি এবং অধ্যক্ষের শূন্য পদ পূরণ করার ব্যাপারে কিছুটা উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং এ ব্যাপারে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু (নেতাজীর দাদা) কে পরপর তিনখানি পত্র দিয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে শরৎবাবু ডাঃ পালকে ২২ আগষ্ট, ১৯৪৮ একটি চিঠি লেখেন। যার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে। তিনি উডবার্ন পার্ক, কলকাতা-২০ থেকে লিখছেন, "তোমার তিনখানা চিঠি পেয়েছি। ... উত্তর দিতে পারিনি। কলেজে ছাত্র সংখ্যা কিছু মন্দ হয়নি। প্রথম বছরে খুব বেশি আশা করা যায় না। তুমি যে কাজে ব্রতী হয়েছ, তাতে সফলতা লাভ করবে আমার বিশ্বাস। ... প্রিন্সিপাল হবার মতো উপযুক্ত লোক এখন আমার সন্ধানে নেই। যদি খোঁজ পাই জানাব।"[১৩] যাইহোক ছ'মাসের মধ্যে এই কলেজে ১৯৪৮-এর অক্টোবরে প্রথম অধ্যক্ষ হয়ে এসেছিলেন ভবানীচরণ গুহ মহাশয়। তিনি ঐ পদে ছিলেন ১৯৪৯-এর জুলাই পর্যন্ত। উল্লেখ্য, কলেজ শুরুর সময় শিক্ষক/অধ্যাপক ছিলেন ৯ জন। এঁরা হলেন যথাক্রমে শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ), নন্দলাল প্রামাণিক (বাংলা), শৈলেন পোদ্দার (ইংরাজী), মুরলীধর চক্রবর্তী (সংস্কৃত), ক্ষুদিরাম বসু (বাণিজ্য), শৈলেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য (রসায়ন), হেমন্তবাবু (প্রাণীবিদ্যা), ঘনশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় (তর্কবিদ্যা) ও অনিলবরণ দাস (ইতিহাস)। এঁরা সকলেই আজ প্রয়াত। এঁরা ছাড়াও স্থানীয় চিকিৎসক ও আইনজীবিদের কেউ কেউ অধ্যাপনার কাজে মাঝে মাঝে সাহায্য করতেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, প্রথিতযশা উকিল স্বর্গীয় শৈলেশ্বর পাল মাঝে মাঝে ইংরাজীর ক্লাস নিতেন। আবার বেশ কিছুদিন আরামবাগ হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই কলেজে ইংরাজী পড়িয়েছিলেন। উনি বিশেষ করে পড়াতেন জন মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট'। প্রারম্ভিক পর্বে শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা ছিল তিন, যাঁরা আজ আর ইহজগতে নেই। এঁদের মধ্যে স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ পাল ছিলেন প্রধান করণিক। বেশির ভাগ কাজ তিনিই করতেন। এছাড়া ছিলেন স্বর্গীয় কৃষ্ণপদ সরকার ও স্বর্গীয় দুর্গাকিঙ্কর মুখার্জী। এই তিনজন ছাড়াও অল্প কিছুকাল পর উড়িষ্যা থেকে আগত শিবুদা (পদবী জানতে পারা যায়নি) নামে একজন নিষ্ঠাবান কর্মী কলেজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বেশ সুমধুর।

নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের একেবারে প্রারম্ভিক পর্বের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র ভর্তি সংক্রান্ত আলোচনার পাশাপাশি সেই সময় কলেজ পরিচালনা তথা পরিচালকমণ্ডলী (গভর্নিং বডি) সম্পর্কে আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় হবে। এ ব্যাপারে কোনো লিখিত তথ্য পাওয়া যায়নি। তৃতীয় ব্যাচের ছাত্র শ্রদ্ধেয় ব্রজমোহন কুণ্ডুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর স্মৃতিশক্তির ওপর ভিত্তি করে কয়েকটি নাম জানতে পারলাম। এঁরা হলেন স্বর্গীয় হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় - তিনি ছিলেন প্রথম সভাপতি। তাঁর আদি বাড়ি ছিল বদনগঞ্জে। লোহার বড় ব্যবসার সূত্রে তিনি তখন কলকাতার বিডন রো-তে বসবাস করতেন। অপর সদস্য হলেন ঘোষবাবু

(খুব সম্ভবত স্বর্গীয় বিমলেন্দু ঘোষ)। তাঁর বাড়ি ছিল কাবলের পাশাপাশি গ্রাম কেশবপুরে। তিনিও কর্মসূত্রে কলকাতার বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন। বাকি পরিচিত দুজন সদস্যের নাম সঠিক ভাবে জানা যায়। এঁরা হলেন স্বর্গীয় ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল (সম্ভবত সম্পাদক) এবং কালিপুরের আঢ্য পরিবারের স্বর্গীয় সরোজ আঢ্য। কর্মসূত্রে তিনিও কলকাতায় বসবাস করতেন। এছাড়া পদাধিকার বলে সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষ / ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক এই সমিতির সদস্য ছিলেন স্বাভাবিক ভাবেই।

আমাদের মহাবিদ্যালয় তথা এই অঞ্চল ও আরামবাগ মহকুমাবাসীর সৌভাগ্য যে, ১৯৫০-এর দশকের গোড়া থেকেই এর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সূচনা হয়। এর পিছনে প্রধান কাণ্ডারী ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অধ্যক্ষ স্বর্গীয় গুরুদাস সেন মহাশয়। তিনি ছিলেন কলকাতার বিডন স্ট্রীটের অধিবাসী। তাঁর বিষয় ছিল গণিত। পূর্বে উল্লেখিত কলেজের প্রেসিডেন্ট হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি ১৯৪৯-এর জুলাই মাসে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন এবং ঐ পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন ১৯৫৬-র নভেম্বর মাস পর্যন্ত। প্রায় সাড়ে সাত বছরের সময়কালে এই মহাবিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, গৌরব বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি সমকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। তাঁর সময়কালে এই মহাবিদ্যালয় থেকে ইন্টারমিডিয়েটে যাঁরা আই.এ. ও আই. এস.সি. পাশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনজন পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানেই অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এঁরা হলেন যথাক্রমে স্বর্গীয় পীযূষকান্তি পাল, শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র মাল এবং স্বর্গীয় মুরারী মোহন মান্না। আমি যখন ১৯৯০-এর দশকের গোড়ায় এই কলেজে যোগদান করি তখন এঁদের সকলেরই সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলাম। মাননীয় অধ্যক্ষ গুরুদাস সেন সম্পর্কে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এঁদের কাছে শুনেছি এবং কিছু কিছু লেখায় তাঁর যে ছাত্র তথা মানবদরদী মনোভাবের পরিচয় পেয়েছি, তার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরলাম। আমার এই কলেজে চাকরি জীবন শুরুর কয়েকমাস পরে তৎকালীন স্টাফরুমে একদিন কথা প্রসঙ্গে পীযূষবাবু আমাকে বলছিলেন, " আমি জীবনে কখনো এই কলেজে আমার মাষ্টারমশাই ও অধ্যক্ষ গুরুদাস সেনের মতো জ্ঞানী, গাম্ভীর্যপূর্ণ অথচ সহজ-সরল ও ছাত্রদরদী মানুষ দেখিনি। প্রশাসক ও শিক্ষক - উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অসাধারণ একজন ব্যক্তিত্ব।" ১৯৭৩ সালে কলেজের রজত জয়ন্তী বর্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় অধ্যাপক দুলালচন্দ্র মাল লিখেছেন, "আদর্শবাদী, কর্মদক্ষ অধ্যক্ষ হিসাবে শ্রীযুক্ত গুরুদাস সেনই এই কলেজের ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান তৈরি করে যান।" তিনি আর এক জায়গায় লিখেছেন, "অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গুরুদাস সেন ছিলেন এক দেবতুল্য মানুষ। তাঁর মধ্যে যেমন গাম্ভীর্য ছিল, তেমনি ছিল কোমলতা। ছাত্রদের সঙ্গে তিনি বন্ধুদের মতো মিশতেন।" অধ্যাপক স্বর্গীয় মুরারি মোহন মান্না (১৯৫৪-১৯৫৬ ব্যাচের ছাত্র) ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত রজত জয়ন্তী বর্ষ সংখ্যায় 'দিনগুলি মোর রইল না' নামক একটি প্রবন্ধে অধ্যক্ষ স্বর্গীয় গুরুদাস সেনের ব্যক্তিত্বকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন এই ভাবে -

"ঐ স্বাস্থ্যবান কালো রঙের মানুষটি চোখে বেশি পাওয়ারের পুরু চশমা, চোখের চাউনি উদাসীন আবার কখনো তীক্ষ্ণ ... সব মিলিয়ে প্রতিভা ও প্রতিজ্ঞার এক আশ্চর্য দেববিগ্রহ। সেই বিগ্রহকে ... কখনো কাছে গিয়ে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করেছি, গম্ভীর কণ্ঠের বজ্রহুংকারে কখনো ভয় পেয়েছি, কখনো অবার গাম্ভীর্যের অন্তরালে মমতামেদুর পিতৃহৃদয়ের স্নেহস্পর্শে অভিভূত হয়েছি।"[১৪]

বস্তুত, এই মহাবিদ্যালয়ের সূচনালগ্নে কলেজের পঠন-পাঠন ও প্রাথমিক পরিকাঠামো তৈরির দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছিল সুযোগ্য অধ্যক্ষের ওপর। তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন কুণ্ডুর কাছ থেকে জানলাম যে, তিনি এখানে স্থায়ীভাবে থাকতেন। কলেজে ক্লাস শুরুর আগে বা পরে কোনো ছাত্র কিছু জানতে এলে অধ্যক্ষ মহাশয় কলেজের আমতলায় মাটিতে বসে ইটের টুকরো দিয়ে ছবি এঁকে অঙ্ক বুঝিয়ে দিতেন। প্রয়োজন হলে পদার্থ বিদ্যার ক্লাসও নিতেন। যা আজকের দিনে বিরল। তিনিই প্রকৃতপক্ষে এই নব প্রতিষ্ঠিত কলেজের সুনাম অর্জনের সাথে সাথে ভবিষ্যতে মহীরূহে পরিণত হবার ভিত্তি তৈরি করে গিয়েছিলেন। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, তাঁর অভাবনীয় ব্যক্তিত্বের গুণে বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপক তথা মানুষ গড়ার কারিগররা এবং স্থানীয় বুদ্ধিজীবি ও কিছু উদার মনস্ক মানুষ শিক্ষার্থীদের সুবিধার কথা ভেবে কলেজের প্রারম্ভিক পরিকাঠামোর নানাবিধ অসুবিধাগুলিকে আন্তরিকভাবে মানিয়ে নিয়ে নিজেদের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছিলেন। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলবে ১৯৫০-এর দশকের প্রথমদিকে এই মহাবিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা ছাত্র, যাঁরা আজও জীবিত আছেন এই সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁদের মূল্যবান লেখাগুলি পাঠ করলে। উল্লেখ্য, এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে ও এর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে এই নতুন অধ্যক্ষের সময় থেকেই।

একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, এই ধরণের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিংশ শতকের মধ্যভাগে স্থাপন করা ছিল যেমন কষ্টসাধ্য, একে সুদৃঢ় ও মজবুত ভিতের ওপর গড়ে তুলে ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান তৈরি করাও ছিল তেমনি দুরূহ। এই দুরূহ কাজকে মাত্র সাত বছরের মধ্যেই অধ্যক্ষ গুরুদাস সেন অনেকাংশে মোকাবিলা করেছিলেন। কলেজ প্রশাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় তিনি যেমন ছিলেন দায়িত্বশীল, তেমনি কঠোর। কলেজের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত স্মরণিকায় প্রয়াত অধ্যাপক মুরারি মোহন মান্না (প্রাক্তন ছাত্র)-র লেখা ওপরে উল্লেখিত প্রবন্ধ থেকে এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় তুলে ধরছি। উল্লেখ্য, ১৯৫৪ সালে First Terminal Examination-এর তারিখ অধ্যক্ষ মহাশয় হঠাৎ করে ঘোষণা করলে ছাত্ররা গোপনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তারা কেউ পরীক্ষায় বসবে না, ধর্মঘট করবে। মুরারীবাবুর ভাষায়, "এই সংবাদটি তিনি কোনোভাবে পেয়ে যান ... সহস্র-চক্ষু ইন্দ্রের মতো সবদিকে তাঁর চোখ! এর দুদিন পরে ইংরাজীর common class শুরু হবার আগেই রুদ্রদেব শিবের মতো তিনি শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে কয়েকটি কথা বললেন, 'শুনলুম তোমরা পরীক্ষা দেবে না। পরীক্ষা হবেই। যথাদিনে শূন্য বেঞ্চিতেই খাতা ও প্রশ্নপত্র দেওয়া হবে'। ছাত্রদের

অবস্থা তখন ভীষণ ঝড়ে বিধ্বস্ত বৃক্ষপল্লবের মতো। বলা বাহুল্য, নির্ধারিত দিনে আমরা সবাই পরীক্ষা দিয়েছিলুম।" আসলে তাঁর স্বপ্নের নেতাজী মহাবিদ্যালয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ও ছাত্রদের মানুষ করে তোলাই ছিল অধ্যক্ষ গুরুদাস সেনের প্রধান ব্রত।

তাঁর সময়ে (জুলাই, ১৯৪৯ - নভেম্বর, ১৯৫৬) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইন্টারমিডিয়েট স্তরে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে পঠন-পাঠনের পাশাপাশি আনুষঙ্গিক বিভিন্ন দিক যেমন খেলাধুলা, স্টুডেন্ট ম্যাগাজিনের নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল প্রকাশনা, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন পালন, প্রজাতন্ত্র ও স্বাধীনতা দিবস পালন, দোল উৎসব পালন, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন - গান, আবৃত্তি, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রদের অংশগ্রহণে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন।[১৫] বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য পেয়েছিলেন সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের। অধ্যক্ষ গুরুদাস সেন মহাশয়ের আমলের একেবারে গোড়ায় শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনের বাইরে দুটি বিষয় যথা, খেলাধুলা ও কলেজের ছাত্রদের বার্ষিক ম্যাগাজিন ('নেতাজী মহাবিদ্যালয় পত্রিকা', পরে নাম হয় 'উৎসর্গ') সংক্রান্ত স্বল্প কিছু মৌলিক তথ্যের উপর নির্ভর করে ঐ দুটি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করলাম।

কলেজের ছাত্রদের ম্যাগাজিন 'নেতাজী মহাবিদ্যালয় পত্রিকা' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর (বাংলা সন ১৩৫৬, ১৯ ভাদ্র) অর্থাৎ অধ্যক্ষ সেন মহাশয় যোগদান করার দু'মাস পর এবং কলেজ প্রতিষ্ঠার এক বছর এক মাস পর। এই পত্রিকার উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজী (যিনি এর আগে কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন)। এই শুভেচ্ছাবার্তার মূল কথা ছিল, "ছাত্রদের এই শুভ প্রচেষ্টা শ্রী শ্রী ঁভগবানের কৃপায় সাফল্যমণ্ডিত হউক ও প্রত্যেকটি ছাত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতবর্ষের সেবায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করুক ...।"

এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাতেই অধ্যক্ষ প্রয়াত গুরুদাস সেন মহাশয় 'I Love My College' শিরোনামে যা লিখেছেন তা এখানে হুবহু তুলে ধরলাম -

"My Colleague, in charge of the Magazine, came to me in the evening. Preliminaries being over, he asked for 'a few words' for the First Number. 'I Love my College' was all that I handed over to him.

I love my students in their class rooms, an inquisitive batch with intelligent questions, where lecturing is being substituted by learning. I love to see them in the corridors, in the free periods and recesses - chit-chatting with a spirit of give and

take. There is an atmosphere of mutual goodwill, service and devotion. This Mahavidyalaya expects every student to become a perfect gentleman and a worthy citizen of Free India. "Jnan, Tyag, Seva" Should be thier ideal.

Then I love my colleagues - a noble band of workers - silent, smiling and straight. Their Co-operation and support, I always enjoy. There may be Colleges better equipped and more furnished - colleges with gorgeous green and palatial buildings - colleges with number and numbers of students, but my college that stands on the bank of river Dwarakeswar at the far corner of Arambagh and that may be converted fairly land by my successors, has a peculiar charm, and unspeakable fascination of its own. Through its veins flows the blood of love. My love is not of the type - 'my country right or wrong' but ... I am proud of it. I love it."

মহাবিদ্যালয় সম্পর্কে অধ্যক্ষ মহাশয়ের এই মতামত মহামূল্যবান। এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, এই প্রতিষ্ঠানকে তিনি কতখানি ভালোবেসে ফেলেছিলেন। একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে, এর প্রতিষ্ঠার একেবারে গোড়ায় এই ধরণেরই এক অভিভাবকসুলভ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল। এটা আমাদের, তথা এই এলাকার মানুষের বড়ই সৌভাগ্য বলা যেতে পারে। প্রকৃতির নিয়মে তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু সেই আমতলা, বেদী সব কিছুই আছে, যেখানে তিনি প্রয়োজনে মাটিতে বসে ইট দিয়ে এঁকে ছেলেদের অঙ্ক শেখাতেন। আর আজও আছেন তাঁর শিক্ষায় আলোকিত কিছু গুণমুগ্ধ ছাত্র, যাঁদের লেখনী থেকে আমরাও সমৃদ্ধ হয়েছি। আশাকরি ভবিষ্যতের শিক্ষার্থীরাও এই প্রতিষ্ঠানকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা এবং ছাত্র তথা সমাজের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসার বিষয়টিকে মনে রাখবে। এইভাবে তিনি সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষের মনের মণিকোঠায় বেঁচে থাকবেন।

খেলাধুলার ক্ষেত্রেও নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের সুখ্যাতি ছিল এর প্রায় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই। আমি একেবারে গোড়ার দিকে বিশেষ করে ১৯৪৮-১৯৪৯ সালে অর্থাৎ এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে স্বর্গীয় গুরুদাস সেন মহাশয় অধ্যক্ষ হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদানের কয়েকমাস পর পর্যন্ত খেলাধুলার প্রগতির একটি তথ্যভিত্তিক বিবরণ এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এ ব্যাপারে অন্যতম প্রধান তথ্যসূত্র হল 'নেতাজী মহাবিদ্যালয় পত্রিকা'-র শেষে লিখিত 'খেলাধূলা' শিরোনাম, যেটা লিখেছিলেন ১৯৪৯ সালে বিজ্ঞান বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র ও নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের ক্রীড়াধিনায়ক নিমাইচরণ বটব্যাল। উল্লেখ্য, তখন খেলা বলতে ফুটবল ও ভলিবল খেলারই প্রচলন ছিল।

এখানে সেই সময় নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের খেলাধুলা বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিবরণ ঐ সংখ্যার 'খেলাধুলা' শিরোনাম থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি -

"গত বৎসর (১৯৪৮) কলেজ স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলারও ব্যবস্থা হয়। গত বৎসর আমাদের কলেজ foot-ball খেলা অপেক্ষা volley-ball খেলায় বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। ঐ বছর ২৫শে আগষ্ট নেতাজী মহাবিদ্যালয় বনাম আরামবাগ টাউন ক্লাব একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়। ঐ খেলায় নেতাজী মহাবিদ্যালয় ১-২ গোলে বিজিত হয়, বিজয়ী হয় আরামবাগ টাউন ক্লাব। ... এইটি কলেজের প্রথম প্রতিযোগিতায় যোগদান। ... এরপর ১৯৪৮ এর ৪ঠা সেপ্টেম্বর থেকে পূজার ছুটির আগে পর্যন্ত নেতাজী মহাবিদ্যালয় বনাম আরামবাগ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় স্কুল ময়দানে। কিছুদিন ছাড়া ছাড়া দুটি দলের মধ্যে মোট তিনটি খেলা হয়। তিনটি খেলাই ড্র হয়। খেলাগুলি বেশ উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে এবং ময়দানে আরামবাগ মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এবং টাউনের পদস্থ ভদ্রমণ্ডলী উপস্থিত থাকেন।" এই প্রতিবেদনটি থেকে আরো জানা যায় যে, ১৯৪৮-এর নভেম্বর মাসের শেষ থেকে ভলিবল খেলা শুরু হয়। ১৯৪৯-এর ৯ই জানুয়ারী, ২৬ জানুয়ারী এবং ১০ই ফেব্রুয়ারী আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয় বনাম আরামবাগ টাউন ক্লাবের মধ্যে ভলিবল প্রতিযোগিতা হয়। এই তিনটি প্রতিযোগিতাতেই নেতাজী মহাবিদ্যালয় জয়ী হয়।

অতঃপর ১৯৪৯-এর ১২ই জুলাই নেতাজী মহাবিদ্যালয় বনাম আরামবাগ টাউন ক্লাবের একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় টাউন ক্লাবের ময়দানে। এই খেলাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে এই কারণে যে এতে আরামবাগ মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয় ও অন্যান্য অফিসাররা অংশগ্রহণ করেন। এই প্রতিযোগিতায় নেতাজী মহাবিদ্যালয় প্রথম ফুটবল খেলায় জয়লাভ করে। আরামবাগ টাউন ক্লাব ছাড়াও স্থানীয় বিভিন্ন এলাকার ক্লাব যেমন কোড়লা খামারবেড় ফুটবল ক্লাব, হরিহরবাটী ফুটবল ক্লাব, কেশবপুর মহামেডান স্পোর্টিং-এর সঙ্গে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের ফুটবল টিম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করত। এক কথায় নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের খেলাধুলা বিভাগ ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালেই যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। এইভাবে নেতাজী মহাবিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এর জন্মলগ্ন থেকেই এই এলাকায় একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল, যার ধারা আজও বহমান।

নেতাজী মহাবিদ্যালয় পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'খেলাধুলা' শিরোনামের শেষাংশে ১৯৪৯-এর ২৫শে আগষ্ট নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের ক্রীড়া বিভাগের নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের যে তালিকা পাওয়া যায়, তা এখানে উল্লেখ করা হল -

সভাপতি - শ্রীযুক্ত গুরুদাস সেন (অধ্যক্ষ), সম্পাদক - শ্রী সত্যেনকুমার পাল (২য় বর্ষ বাণিজ্য বিভাগ), ক্রীড়াধিনায়ক - শ্রী নিমাইচন্দ্র বটব্যাল (২য় বর্ষ, বিজ্ঞান বিভাগ), সহ-ক্রীড়াধিনায়ক - শ্রী হিরণকুমার দে (২য়

বর্ষ, বিজ্ঞান বিভাগ), শ্রী সত্যশংকর সাহানা (২য় বর্ষ, বিজ্ঞান বিভাগ), শ্রী অমলেশ কুমার দে (২য় বর্ষ, বিজ্ঞান বিভাগ), শ্রী নিতাইচন্দ্র আঢ্য (১ম বর্ষ, বিজ্ঞান বিভাগ) এবং শ্রী নিরঞ্জন কুমার সরকার (১ম বর্ষ, বিজ্ঞান বিভাগ)।

এখন কলেজ শুরুর সময় ও তার কিছুকাল পর পর্যন্ত অর্থাৎ প্রয়াত অধ্যক্ষ গুরুদাস সেনের সময় পর্যন্ত (নভেম্বর, ১৯৫৬) এর পরিকাঠামো ও পরিবেশ কেমন ছিল, সমকালীন ছাত্রদের কাছে শোনা ও তাঁদের সংক্ষিপ্ত কিছু লেখা থেকে এর অনুপুঙ্খ বিবরণ দেবার চেষ্টা করছি। কালিপুরে বকুলতলায় আঢ্যদের বাড়িতে (যা এখনও বর্তমান) বর্তমান কলেজ গেট থেকে বিপরীত দিকে সামান্য একটু দূরে যে ক্লাস শুরু হয়েছিল, তা আগে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছি। কিন্তু পরিকাঠামো উল্লেখ করিনি। ১৯৫০ সালে (তৃতীয় ব্যাচ) এই কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এমন দুজন ছাত্র যথা শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন কুণ্ডু ও শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মেদ্দার স্মৃতিচারণা থেকে এ বিষয়ে কিছুটা স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়। ব্রজমোহনবাবুর ভাষায় - ''আঢ্য পরিবারের গোশালা সংলগ্ন ঘরে পঠন-পাঠনের কাজ চলত। মাটির চালাঘর, মেঝে অসমান, বেঞ্চ, হাইবেঞ্চ নড়তো, দক্ষিণ দিক খোলা।" এইরকম পরিবেশও তাঁদের কাছে অকল্পনীয় আনন্দের ধারা বয়ে নিয়ে এসেছিল। তাঁর কথায় 'শ্রেণীকক্ষকে যেন মনে হত মন্দির'। শিল্পগুরু হরিপ্রসাদ মেদ্দার কথায় - ''ক্লাস হত আঢ্যদের পোড়ো বাড়ির নীচের তলার তিনটি কামরায়। একটিতে আবার অফিস, স্থান সংকুলান না হলে পিছনে গোয়ালের গরুগুলিকে সরিয়ে দিয়ে সেখানেও ক্লাস হত।" এঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের পরিপ্রেক্ষিতে এঁদের ব্যাচের আরো কয়েকজন ছাত্রের নাম জানা যায়। এঁরা হলেন - রতন খাঁ, স্বর্গীয় নিমাইচন্দ্র কুণ্ডু, সুকুমার মুখোপাধ্যায়, মানস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রথম ব্যাচের ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন প্রয়াত অধ্যাপক পীযূষকান্তি পাল - যিনি এই কলেজে সুদীর্ঘকাল গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রথম ব্যাচের ছাত্রদের মধ্যে আরো যাঁদের নাম জানা যায় তাঁরা হলেন - সত্যেন কুমার পাল (কলেজের প্রধান করণিক), নিমাই চরণ বটব্যাল, মদনমোহন সেন, সমরেন্দ্রনাথ দত্ত, হিরণকুমার দে, অমলেশ কুমার দেব, সত্য শংকর সাহানা, রাধামাধব কুণ্ডু, সদানন্দ বসু। দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্রদের মধ্যে দুজনের নাম জানতে পেরেছি। এঁরা হলেন নিতাইচন্দ্র আঢ্য ও নিরঞ্জন কুমার সরকার।

যাই হোক না কেন, ১৯৪৮-এর ১লা আগষ্ট আঢ্যদের বাড়িতে যখন নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন শুরু হয়েছিল, তার কয়েক মাস আগে থেকেই কলেজের নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেখানে বর্তমানে ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পালের আবক্ষ মূর্তি অবস্থিত আছে, তার ঠিক পিছনে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা পূর্বমুখী যে তিনতলা (সায়েন্স বিল্ডিং) বিল্ডিংটি আছে (অর্থাৎ পরিবেশ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সংগীত প্রভৃতি বিভাগ আছে যে বিল্ডিং-এ) সেখানে একটি লম্বা মাটির ঘর তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। সেটির কাজ সম্পন্ন হয়

১৯৫১ সালে। ঐ বছর থেকেই আঢ্যদের বাড়ির পরিবর্তে কলেজের নিজস্ব ক্যাম্পাসে পঠন-পাঠন চালু হয়। তখন অধ্যক্ষ ছিলেন স্বর্গীয় গুরুদাস সেন মহাশয়। কলেজের এই প্রথম বাড়িটি ছিল একটি লম্বা বড় হলঘর। বাড়িটির চারদিকে ছিল ইটের দেওয়াল, কাদার গাঁথনি ও সিমেন্টের প্লাস্টার। উপরে ছিল টিনের ছাউনি। উল্লেখ্য, এই বড় হলঘরটিতেই কলেজের প্রায় সমস্ত বিষয়ের ক্লাস হত। ব্রজমোহনবাবুর সঙ্গে কথা বলে জানলাম এই হলঘরটিকেই রং করা চটের দেওয়াল এবং চট দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য পৃথক কামরা তৈরি করা হয়েছিল। এখানেই ছিল ছোট একটি লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরি। এছাড়া আমতলার দক্ষিণ দিকে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা একটি পাকা বাড়ি অল্প দিনের মধ্যেই তৈরি হয়, এর কামরা ছিল তিনটি। একটি অফিসঘর এবং অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক মহাশয়দের জন্য ছিল পৃথক দুটি ঘর। প্রসঙ্গত বলা যায়, দু-এক বছর পর ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলে কলেজ প্রাঙ্গনে আমগাছের চারপাশে বেদি তৈরি করে অনেক সময় ক্লাসের ব্যবস্থা করা হত। এতদসত্ত্বেও অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও নিখাদ ভালোবাসার দরুণ ঐ পরিকাঠামোর মধ্যেই পঠন-পাঠন এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে হার্দিক সম্পর্ক সকলের নজর কেড়েছিল। এই সম্পর্ক ছিল মানবিকতা ও মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এরই আকর্ষণে ও অবশ্যই উচ্চশিক্ষা লাভের আকাঙ্খায় স্থানীয় ও দূর দূরান্তের বহু দরিদ্র ও সাধারণ পরিবারের ছাত্ররা প্রতিদিন ক্লাসে উপস্থিত থাকত।

দূর-দূরান্তের ছাত্রদের অসুবিধার কথা ভেবে ঐ একই সময়ে (১৯৫১-৫২) বর্তমান খেলার মাঠের পশ্চিমদিকে (যেটা বর্তমানে বিজয় মোদক ভবন) উত্তর-দক্ষিণে লম্বা মাটির ছিটেবেড়া দেওয়া একটি বড় ঘর তৈরি হয়। এটি ছিল খড়ের ছাউনি। এখানে হোস্টেল (ছাত্রাবাস) স্থানান্তরিত হয়। খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটির এই ঘরটি কতকগুলি ছোট ছোট ঘরে বিভক্ত ছিল। দক্ষিণ দিকের ঘরগুলি ছিল ছাত্রাবাস। উত্তর দিকের বেশ কয়েকটি ঘরে বিভিন্ন বিভাগের অনার্স ক্লাস হত। এই ঘরগুলির অস্তিত্ব একবিংশ শতকের গোড়াতেও ছিল। আমি (এপ্রিল, ১৯৯৩) এবং আমার আগে ও কিছুকাল পরেও যাঁরা এই মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে যোগদান করেছেন ঐ ঘরগুলিতে পড়ানোর নানা মজার অভিজ্ঞতা তাঁদের অর্জিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। উল্লেখ্য, বর্তমান অধ্যক্ষ ড. অসীম কুমার দে এই মহাবিদ্যালয়ে ১লা মার্চ, ২০০৩-এ যোগদানের কিছুকাল পর থেকে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ধাপে ধাপে এখানে সুন্দর তিনতলা বিল্ডিং (বি. এম. বিল্ডিং) তৈরি হয়। উল্লেখ্য, একতলা (গ্রাউন্ড ফ্লোর) তৈরি সম্পন্ন হয়েছিল ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বরে। এক্ষেত্রে তৎকালীন গভর্নিং বডির সভাপতি স্বর্গীয় বিনয় দত্ত মহাশয় এবং অন্যান্য সদস্যদের সুযোগ্য ভূমিকা অনস্বীকার্য। ছাত্রাবাসের যে কথা ওপরে বলছিলাম, সে প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ছাত্রাবাসের পাশেই পশ্চিমদিকে ছিল ছাত্রদের খাবার ঘর (Kitchen)। তার সামনে ছিল জলজ উদ্ভিদে ভরা একটি ডোবা। অধ্যক্ষ ড. দে-র সক্রিয় উদ্যোগে ঐ ডোবা ভরাট করে বেশ কিছু মূল্যবান গাছ লাগানো হয়েছে।

## ছয়

এতক্ষণ যে আলোচনা করা হল তার ভিত্তিতে বোঝা সম্ভব হল যে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের সূচনা ঘটেছিল যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে, সমকালীন ও পরবর্তীকালের সমাজসেবী, উদারমনা কিছু ব্যক্তি, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক এবং ছাত্রদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও নিষ্ঠা এবং অবশ্যই সকলের মধ্যে এক সুমধুর, হার্দিক সম্পর্কের সূত্র ধরেই পঠন-পাঠনের সাথে সাথে ক্রমশ কলেজের সার্বিক অগ্রগতি ঘটতে থাকল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবপ্রতিষ্ঠিত আরামবাগের এই নেতাজী মহাবিদ্যালয় ইন্টারমিডিয়েটে তিনটি বিভাগেই (কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য) ধারাবাহিকভাবে ভালো ফল করায় তার সুনাম বৃদ্ধি পেল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই মহাবিদ্যালয়কে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক পড়ানোর অনুমতি দেন। বলা বাহুল্য, আরামবাগ মহকুমা ও সংলগ্ন অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের পক্ষে এটা ছিল বড়ই সুখের বিষয়। কারণ এতদিন কেবলমাত্র খুব স্বচ্ছল পরিবারের ছাত্ররা বর্ধমান, কলকাতা ও অন্যত্র পড়াশোনা করতে পারত। কিন্তু এই অনুমোদনের ফলে সাধারণ ও দরিদ্র পরিবারের ছাত্ররাও তাদের বাড়ি থেকে এই প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন যাতায়াত করে স্নিগ্ধ ও মনোরম পরিবেশে পড়াশোনা করার সুযোগ পেল। ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পালের স্বপ্ন পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

নেতাজী মহাবিদ্যালয় যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলা বিভাগে স্নাতক পড়ানোর অনুমোদন লাভ করল তখন অধ্যক্ষ মহাশয়ের পরিবর্তন ঘটেছে। স্বর্গীয় গুরুদাস সেন মহাশয়ের পরিবর্তে নতুন অধ্যক্ষ হয়ে এসেছেন স্বর্গীয় অনিলবরণ দাস মহাশয়। তাঁর বিষয় ছিল ইতিহাস। তিনি ১৯৫৬-র নভেম্বর থেকে ১৯৫৯-এর শেষ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ প্রশাসক। কলেজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ঘটানোই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তাঁর সময়েই এই মহাবিদ্যালয় প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদন লাভ করে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, ঐ অনুমোদন তথা U.G.C.-র অর্থানুকুল্যেই কলেজ প্রাঙ্গনের পূর্বদিকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা পশ্চিমমুখী যে তিনতলা বিল্ডিং বর্তমান তার একতলা (Ground Floor) নির্মিত হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই বি. এ. (স্নাতক কোর্স) চালুর পর শ্রেণীকক্ষের যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল তার আশু সমাধান হয়। এছাড়া ইতিপূর্বে অধ্যক্ষ গুরুদাসবাবুর সময়ে আমতলার দক্ষিণদিকে পুব-পশ্চিমে লম্বা আয়তনে ছোট যে পাকা বাড়িটির একতলা (Ground Floor) তৈরি হয়েছিল তার দোতলাটি ইতিমধ্যে নির্মিত হয়। দোতলায় পূর্বদিকে ছিল অধ্যক্ষের অফিস (ঘর), পাশের ঘরে ছিল এ্যাকাউন্টস অফিস এবং তার পাশে পশ্চিমদিকে ছিল লাইব্রেরি। নীচেরতলায় একদিকে ছিল জেনারেল অফিস ও স্টাফরুম অর্থাৎ অধ্যাপকদের বসার জায়গা এবং আর একদিকে ছাত্রীদের জন্য কমনরুম তৈরি করা হয়। শুধু তাই নয়, বর্তমানে কলেজ ক্যাম্পাসে পুব-পশ্চিমে লম্বা দক্ষিণমুখী যে ত্রিতল বিল্ডিংটি আছে তার গ্রাউন্ড ফ্লোর অর্থাৎ যেখানে একসময় স্টাফরুম, গ্রন্থাগার প্রভৃতি ছিল এবং বর্তমানে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ আছে সেটি নির্মিত

হয়েছিল অনিলবাবুর সময়ে এবং অবশ্যই ম্যানেজিং কমিটির সহযোগিতায়।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ অধ্যক্ষ অনিলবাবুর সময়েই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই কলেজে সহশিক্ষা (Co-education)-র অনুমোদন দেন। উদ্দেশ্য ছিল উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো। এটি কার্যকরী হয়েছিল পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে। ঐ বছর ইন্টারমিডিয়েটে কোনো ছাত্রী ভর্তি হয়নি। তবে বি. এ ক্লাসে দুজন ছাত্রী ভর্তি হয়েছিল। এঁদের নামগুলি হল যথাক্রমে মীরা ভঞ্জ (রায়) ও রেণুকা পাল।[১৬] এই দিক থেকে বিচার করলে নেতাজী মহাবিদ্যালয় তথা আরামবাগ মহকুমায় রেগুলার কোর্সে বি.এ ক্লাসের প্রথম দুই ছাত্রী ছিলেন এঁরাই। প্রসঙ্গত বলা যায় আরামবাগ মহকুমায় স্থাপিত প্রথম এই কলেজ থেকেই রেগুলার কোর্সে প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট (১৯৬১) হন মীরা ভঞ্জ (রায়)। তবে রেণুকা পাল শেষ পর্যন্ত বি. এ. ফাইনাল পরীক্ষা দেননি। সুখের বিষয় এঁরা দুজনেই আজও জীবিত। উল্লেখ্য, কলেজে সহ-শিক্ষা চালু হবার পর বেশ বড় বয়সে এঁরা কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। এঁদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের মাধ্যমে জানলাম এঁদের বর্তমান বয়স যথাক্রমে ৯২ ও ৯১। এই সময় কলেজে অধ্যক্ষ মহাশয় ছাড়া অন্যান্য অধ্যাপকরা হলেন কালীপদ দত্ত (রসায়ন), পীযূষকান্তি পাল (গণিত), গণেশচন্দ্র হাটুই (পদার্থবিদ্যা), কমল কুমার সরকার (উদ্ভিদ বিদ্যা), রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (ইংরাজী), সত্যব্রত ভট্টাচার্য (ইংরাজী), অম্বুজ বসু (বাংলা) এবং দীপক ব্যানার্জী (অর্থনীতি)। এঁরা ছাড়াও বাণিজ্য ও অন্যান্য বিভাগের আরো কিছু অধ্যাপক ছিলেন। এঁরা হলেন চিত্তপ্রিয় রায় (বাণিজ্য), ব্রজেশচন্দ্র দাশ (ইতিহাস), দুলালচন্দ্র মাল (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), সুধীর কুমার দাস পাল প্রমুখ। প্রায় বারো বছর একটানা কলেজের পরিকাঠামো, নির্মাণ ও পঠন-পাঠন স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে গেলেও এর অভ্যন্তরীণ কিছু সম্যসার বহিঃপ্রকাশ ঘটছিল মাঝে মাঝেই। সমকালীন (১৯৫৯-৬০) একজন ছাত্র (ইন্টারমিডিয়েট) পঞ্চানন চক্রবর্তীর লেখা থেকে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করলাম। তিনি লিখেছেন, ''আমার পড়াশোনা প্রথম বছরে ভালোভাবেই হলেও দ্বিতীয় বছর এক দুর্ভাগ্যজনক ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সাথে অধ্যক্ষ মহাশয় অনিলবাবুর সম্পর্ক ভালো ছিল না। সেইসময় ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন স্বর্গীয় রাধাকৃষ্ণ পাল মহাশয়। 'অধ্যক্ষ হটাও' আন্দোলন চলতে থাকে। ছাত্র ইউনিয়নও সেই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। পড়াশোনার খুবই ক্ষতি হয়। অধ্যক্ষ মহাশয় অনিলবাবু (বর্তমানে প্রয়াত) পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।''[১৭] এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র মাল মহাশয়ও কিছুটা পরোক্ষভাবে ঐ বিষয়টির উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায় - ''এই কলেজকে তিনি (অনিলবরণ দাস) বেশি ভালোবেসে ফেলেছিলেন, যা অনেকের সহ্য হল না। শুরু হল ছাত্র আন্দোলন এবং এর ফলে তিনি এই কলেজ ছেড়ে চলে যান কলকাতার মণীন্দ্র কলেজে। পরে বোঝা গেল ঐ ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃত কারণ ও উদ্দেশ্য।''[১৮] এতদসত্ত্বেও কলেজ তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে।

যাই হোক না কেন, সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের প্রতি এই এলাকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রাম ও শহরাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাভাবিক ভাবেই নেতাজী মহাবিদ্যালয় কলকাতার পরিবর্তে ঐ বছরেই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে আসে। উল্লেখ্য, ১৯৬০ সালেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমাদের এই মহাবিদ্যালয় বিজ্ঞানে (Pure Science) স্নাতক (বি. এস. সি) পড়ানোর অনুমোদন লাভ করে। জীববিজ্ঞানে বি. এস. সি কোর্স পড়ানোর অনুমোদন মিলেছিল এর প্রায় এক দশক পর। এখানে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় হবে যে, অধ্যক্ষ অনিলবরণ দাস মহাশয় কলেজ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তৎকালীন এই কলেজের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিত্তপ্রিয় রায় মহাশয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন (১৯৫৯-এর শেষ দিক থেকে ১৯৬২-র অক্টোবর পর্যন্ত)। এই সময়েই ১৯৬২ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নেতাজী মহাবিদ্যালয় বাণিজ্যে স্নাতক (বি. কম) পড়ানোর অনুমোদন পায় সান্ধ্য বিভাগে।

প্রায় দু'বছর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক / অধ্যক্ষ (T. I. C)-র দায়িত্ব পালনের পর ১৯৬২-র নভেম্বরে শ্রীযুক্ত চিত্তপ্রিয় রায় মহাশয় স্থায়ী অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হন। ঐ পদে তিনি বহাল ছিলেন ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত। তাঁর কিছু শারীরিক অসুবিধা ছিল। প্রয়োজন ছাড়া কথা বেশি বলতেন না। কিন্তু কলেজ পরিচালনায় তিনি ছিলেন বেশ দক্ষ ব্যক্তি। এক কথায় কাজের লোক। তাঁর সক্রিয় প্রচেষ্টায় ১৯৬৩ সালে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে প্রথম দুটি বিভাগে সাম্মানিক (অনার্স) কোর্স পড়ানোর অনুমোদন দেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই দুটি বিভাগ হল বাংলা ও গণিত। তখন এই দুটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন যথাক্রমে স্বর্গীয় অম্বুজ বসু এবং স্বর্গীয় পীযূষকান্তি পাল। বাংলা (সাম্মানিক) বিভাগে প্রথম বছর ছাত্র ছিলেন চারজন। এঁরা হলেন শ্রীযুক্ত মুক্তারাম চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শৈলেন চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত সরোজ রায় ও শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ চ্যাটার্জী। এছাড়া ১৯৬৯-এর জুন মাসে বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই কলেজ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হওয়ার আগে তাঁর নিজের বিষয় বাণিজ্য বিভাগে এ্যাকাউন্টেন্সিতে সাম্মানিক কোর্স চালু করার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে যান এবং ঐ বছরেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে অনুমোদন দেন। এ্যাকাউন্টেন্সি অনার্সে প্রথম ব্যাচের ছাত্ররা ছিলেন শ্রীযুক্ত মনিমোহন নন্দী (পরে এই কলেজের অধ্যাপক এবং আমার সহকর্মী), শ্রীযুক্ত শিশির চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত মলয় চট্টরাজ, শ্রীযুক্ত তুহিন রায় ও শ্রীযুক্ত অজয় সামুই প্রমুখ। এইসময় বিভাগীয় প্রধান ছিলেন আদিত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্বর্গীয় শশধর কোলে ১৯৬০-এর দশকের গোড়ায় এই কলেজে অনার্স কোর্স চালু হবার অনেক আগেই এখান থেকে বি. কম (স্নাতক) পাশ করে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.কম-এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং এই কলেজে

সুদীর্ঘকাল ধরে সুনামের সঙ্গে অধ্যাপনা করেন।

অধ্যক্ষ স্বর্গীয় চিত্তপ্রিয় রায় মহাশয়ের সময়কালে (১৯৬২-১৯৬৯) শুধু পঠন-পাঠনের অগ্রগতি ঘটেনি। তাঁর শারীরিক কিছু অসুবিধা ছিল। এই সময় ভাইস প্রিন্সিপ্যাল বা সহ-অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন অধ্যাপক পীযূষকান্তি পাল মহাশয়। চিত্তপ্রিয়বাবু কলেজের সার্বিক অগ্রগতি যেমন - নিয়মিত ভাবে ছাত্রদের ম্যাগাজিন 'উৎসর্গ' প্রকাশ, খেলাধুলা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমস্ত ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে নিষ্ঠা সহকারে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতেন। তাঁর সময়েই ১৯৬৩ সালের ১২ মার্চ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে পালিত হয়েছিল। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী মহাশয়, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অজিত চক্রবর্তী। কলেজ পরিকাঠামোর অগ্রগতিতে তাঁর সময়ে অবশ্য লক্ষণীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়নি। যাই হোক না কেন, প্রায় সাত বছর অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করার পর তাঁকে কলেজ ছেড়ে চলে যেতে হয় (জুন, ১৯৬৯)।

নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রায় একুশ বছর এই প্রতিষ্ঠানের পঠন-পাঠন, পরীক্ষায় ভালো ফলাফল, অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, প্রারম্ভিক পর্বের খেলাধূলা, সংস্কৃতি, বিভিন্ন বিল্ডিং নির্মাণ, ছাত্রাবাস প্রভৃতি বিষয়ে এতক্ষণ আলোচনা করা হল। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে সুমধুর আন্তরিক সম্পর্কের কথাও প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সেই সময় বিষ্ণুপুর মৌজার অন্তর্গত কালিপুরের এই প্রাচীন জনপদে, গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটিতে ছাত্র (১৯৬০-এর দশকের গোড়া থেকে অল্প কিছু ছাত্রী) ও অধ্যাপকদের যাতায়াত ব্যবস্থা কেমন ছিল তা খুব সংক্ষেপে এখানে আলোকপাত করা হল। উল্লেখ্য, আজকের মতো রাস্তাঘাট ও পরিবহন ব্যবস্থা তখন ছিল কল্পনাতীত। আরামবাগ শহর থেকে কালিপুরে অবস্থিত এই মহাবিদ্যালয়ে যাতায়াতের প্রধান বাধা ছিল দ্বারকেশ্বর নদ। তখন রামকৃষ্ণ সেতু তৈরি হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই আরামবাগ ও সংলগ্ন বিস্তৃত অঞ্চল যথা খানাকুল, পুরশুড়া প্রভৃতি এলাকা থেকে এই কলেজে যাঁরা আসতেন তাঁদের দ্বারকেশ্বর নদ পার হতেই হত। এর একটাই মাত্র উপায় ছিল এবং তা হল আরামবাগের সদরঘাট (বড় আনাজ বাজার)-এ প্রথমে পৌঁছানো। এরপর সেখান থেকে বর্ষাকালে ভরা নদীতে নৌকা করে কালিপুর কলেজ। কিন্তু গ্রীষ্মকালে বা অন্যান্য সময়ে বাঁশে তৈরি টলমল করা সাঁকো পেরিয়ে চলতো যাতায়াত। একটু কষ্ট হলেও এর মধ্যে ছিল এক অভিনব আনন্দ। বলতে দ্বিধা নেই যে, বর্তমানে পরিবহন ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি সত্ত্বেও মাঝেমধ্যে দু-একজন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী বন্ধু ও ছাত্র-ছাত্রীরা প্রয়োজন হলে এই পথ ব্যবহার করে থাকেন।

প্রসঙ্গক্রমে কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক পর্বের প্রথম দুই দশকের আরো একটি কথা উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় হবে। দূর-দূরান্তের ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস যে তৈরি হয়েছিল তা ইতিপূর্বে আলোচিত হলেও কলকাতা, বর্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি দূরবর্তী অঞ্চল থেকে যে সমস্ত অধ্যাপক ও অধ্যাপিকারা এই কলেজে পাঠদানের জন্য আসতেন তাঁদের আবাস তথা প্রফেসরস কোয়ার্টার সংক্রান্ত বিষয় অনালোচিত থেকে গেছে। সমকালীন এই কলেজের ছাত্র ও কলেজের বিষয়ে ওয়াকিবহল স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে জানা গেছে যে, বর্তমানে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের বাগানের উত্তরদিকে (অর্থাৎ কলেজের পুরানো গেটের বাইরে) পশ্চিমমুখী যে রাস্তা গেছে ঐ রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে মাঠের ধারে বাম অর্থাৎ দক্ষিণদিকে নির্জন পরিবেশে উঁচু ঢিবিতে দক্ষিণমুখী একটি চার-কামরা দোতলা মাটির পোড়ো (পুরানো) বাড়ি ছিল, এরসঙ্গে ছিল বারান্দা। ঐ বাড়িটিতে অধ্যাপকদের থাকার বন্দোবস্ত ছিল। যাঁরা থাকতেন তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি। এঁরা হলেন স্বর্গীয় চিত্তপ্রিয় রায় (পরে অধ্যক্ষ), শ্রীযুক্ত সত্যব্রত ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত দীপক ব্যানার্জী, শ্রীযুক্ত রবীন ঘোষ, শ্রীযুক্ত নিশীথ ভকত চৌধুরী। তাঁদের সবসময়ের সঙ্গী ছিলেন স্থানীয় সুপরিচিত ফেলুদা যাঁর প্রকৃত নাম ছিল পশুপতি বাগ (শিক্ষাকর্মী)। কয়েক বছর পর দ্বারকেশ্বর নদের তীরে নদীঘাটের উত্তরদিকে অধ্যাপকদের থাকার জন্য নতুন পাকাবাড়ি তথা কোয়ার্টার তৈরি হলে (সম্ভবত চিত্তপ্রিয়বাবুর আমলেই) তাঁরা ঐ মাটির বাড়ি ছেড়ে সেখানে চলে যান। এরপর ঐ মাটির দোতলা বাড়ির নীচের দুটি ঘরে বাংলা অনার্স (সাম্মানিক) প্রথম বর্ষের ক্লাস হত বেশ কয়েক বছর ধরে। এটি ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকের ঘটনা।[১৬]

## সাত

১৯৬৯খ্রিস্টাব্দে অধ্যক্ষ চিত্তপ্রিয় রায় মহাশয়ের পদত্যাগের পর থেকে কলেজ পরিচালন ব্যবস্থায় নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। যদিও পঠন-পাঠন ব্যবস্থায় এর বিশেষ কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি। প্রসঙ্গত বলা যায়, ঐ সময় থেকে ১৯৮৫-র আগস্টে নবদ্বীপ কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এবং নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় এখানের অধ্যক্ষ পদে যোগদানের আগে পর্যন্ত কলেজ বেশিরভাগ সময়েই অধ্যক্ষহীন অবস্থায় পরিচালিত হচ্ছিল - কেবল স্বর্গীয় অধ্যক্ষ সনৎ ব্যানার্জী মহাশয়ের সময়কাল (নভেম্বর, ১৯৭৯ - জুন, ১৯৮৩)টি ছিল ব্যতিক্রম। অধ্যক্ষহীন অবস্থায় কলেজ পরিচালনা সংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনায় যাবার আগে এই সময়ের ইতিবাচক কয়েকটি দিক তুলে ধরছি। প্রথমত, পড়াশোনায় বড় ধরণের কোনো বিঘ্ন ঘটেনি। এতদিন কলেজের পঠন-পাঠন যেভাবে চলছিল তার ধারাবাহিকতায় তেমন কোনো ছেদ পড়েনি। ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকগণ, অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুগণ এবং অবশ্যই ছাত্র-ছাত্রীদের অটুট উৎসাহে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজের সুনাম ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। দ্বিতীয়ত, ইতিপূর্বে ১৯৬৯

পর্যন্ত সময়কালে এই কলেজে বাংলা, গণিতশাস্ত্র, হিসাবশাস্ত্রে সাম্মানিক (অনার্স) কোর্স চালু ছিল। কিন্তু ঐ সময়ের পর থেকে ১৯৮৫-র জুলাই পর্যন্ত আরো কয়েকটি বিষয় যথা সংস্কৃত (১৯৭১), দর্শন (১৯৭১), জীববিজ্ঞান (১৯৭১ পাসকোর্স, পরে অনার্স ১৯৮৩), রসায়ন (১৯৮৩)-এ অনার্স কোর্স শুরু হয়। তৃতীয়ত মহাবিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও সুনাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ছাত্রীদের ভর্তির সংখ্যাও ক্রমশ বাড়তে থাকে। চতুর্থত, মহাবিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল শুরু থেকেই এলাকাবাসীর নজর কাড়ছিল, যা প্রসঙ্গক্রমে আগে আলোচিত হয়েছে। ১৯৬০-এর দশক থেকে তা আরো উচ্চশিখরে পৌঁছায়, বিশেষ করে খেলাধূলার ক্ষেত্রে। সমকালীন অধ্যাপক ও ছাত্রদের লেখা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে বিংশ শতকের আশির দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত নেতাজী মহাবিদ্যালয় বেশিরভাগ সময়েই ফুটবল খেলায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ছিল। এই সময় এ ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র মাল মহাশয়। সেই সময়ের কিছু ছাত্র তথা খেলোয়াড় যথা গিরিজা গোস্বামী, গণেশ অধিকারী, বিশ্বজিৎ পাল, সেখ হুমায়ুন আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টিমে অংশ নিত। বলা বাহুল্য, খেলাধুলার এই অগ্রগতি আজও বহমান। এন. সি. সি. তেও নেতাজী মহাবিদ্যালয় কোনো অংশে পিছিয়ে ছিল না - অধ্যাপক দুলালচন্দ্র মালের নেতৃত্বে এ ব্যাপারে তিনটি কোম্পানি পরিচালিত হত।[২৩]

বিংশ শতকের সাতের দশকের গোড়া থেকে আটের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কলেজ প্রশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থায় যে এক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে এখানে কিছুটা আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় হবে। উল্লেখ্য, স্বর্গীয় অধ্যক্ষ চিত্তপ্রিয় রায় মহাশয় কলেজ ছেড়ে চলে যাবার পর থেকে অধ্যক্ষের পদটা হয়ে গিয়েছিল যেন মিউজিক্যাল চেয়ারের মতো। প্রথমে পূর্বতন সহ-অধ্যক্ষ (ভাইস প্রিন্সিপ্যাল) গণিতের অধ্যাপক পীযূষকান্তি পাল মহাশয় অধ্যক্ষের অবর্তমানে কলেজ পরিচালনার ভার নেন। কিন্তু তিনি ঐ পদে ছিলেন মাত্র ছয় মাস (জুলাই, ১৯৬৯ - ডিসেম্বর, ১৯৬৯)। এরপর ঐ কাজের দায়িত্বভার অর্পিত হয় ইংরাজির অধ্যাপক সত্যব্রত ভট্টাচার্যের ওপর, যিনি এক বছর (জানুয়ারি, ১৯৭০ - ডিসেম্বর, ১৯৭০) ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ইতিমধ্যে কলেজের অভ্যন্তরীন যে কোনো সমস্যার কারণেই হোক না কেন কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সরকারিভাবে কলেজ পরিচালনার জন্য কলেজের প্রশাসক নিযুক্ত হন আরামবাগের তৎকালীন এস. ডি. ও. মহাশয়। এতদসত্ত্বেও কলেজের শিক্ষক সমিতি (Teachers' Council) বিশেষ করে এর প্রবীণ সদস্যদের ভূমিকাও নেহাত কম ছিল না। উল্লেখ্য, প্রবীণ সদস্যদের প্রবল চাপের কাছে মাথা নত করে সত্যব্রত ভট্টাচার্য মহাশয়কে পদত্যাগ করতে হয় ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে এবং ১৯৭১-এর জানুয়ারিতে প্রশাসক (এস. ডি. ও. আরামবাগ) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র মাল মহাশয়কে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান করেন। কিন্তু শিক্ষক সমিতির সদস্যগণ বিশেষ করে প্রবীণ সদস্যদের সঙ্গে মতানৈক্যের জের

হিসাবে তাঁকেও পদত্যাগ করতে হয় ১৯৭৪-এর অক্টোবর মাসে। এইভাবে দীর্ঘ স্থায়ীভাবে অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে কলেজ পরিচালন (বিশেষ করে প্রশাসনিক) ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ঘটে। যাইহোক, এরপর প্রশাসকের নির্দেশ অনুযায়ী স্বর্গীয় ব্রজেশচন্দ্র দাশ মহাশয় (ইতিহাস বিভাগ) এবং শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র মাল মহাশয় (দ্বিতীয়বার) যথাক্রমে আট মাস (নভেম্বর, ১৯৭৪ - জুন, ১৯৭৫) এবং ৪ বছর ৫ মাস (জুলাই, ১৯৭৫ - নভেম্বর, ১৯৭৯) কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করে কাজ চালান। ইতিমধ্যে কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে আসেন অধ্যাপক সনৎ ব্যানার্জী মহাশয়। তিনি উত্তরপাড়া থেকে যাতায়াত করতেন। তিনি প্রায় তিন বছর সাত মাস (ডিসেম্বর, ১৯৭৯ - জুন, ১৯৮৩) অধ্যক্ষপদে আসীন ছিলেন। কলেজের উন্নতি সাধনে তিনি খুব বেশি আত্মনিয়োগ করতে না পারলেও প্রশাসক হিসাবে আরামবাগ এস. ডি. ও-র নিয়ন্ত্রণ উঠে গিয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই।

১৯৮৩-র জুন মাসে স্বর্গীয় সনৎ ব্যানার্জী মহাশয় এই কলেজের অধ্যক্ষ পদ ছেড়ে দিয়ে উত্তরপাড়া কলেজের অধ্যক্ষপদে যোগদান করায় নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের প্রশাসনের কাজ পরিচালনার বিষয়টি পুনরায় বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই সময় অবশ্য সিনিয়রিটির ওপর ভিত্তি করে কলেজের গভর্নিং বডি টিচার-ইন-চার্জ (টি. আই. সি.) নিয়োগের নিয়ম চালু করে। স্বাভাবিকভাবেই অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণের ক্ষেত্রে জটিলতা দূর হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী যথাক্রমে স্বর্গীয় ড. কমলকৃষ্ণ সরকার মহাশয়, একমাস (জুলাই, ১৯৮৩), স্বর্গীয় ড. রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়, চারমাস (আগষ্ট, ১৯৮৩ - নভেম্বর, ১৯৮৩) এবং শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র মাল মহাশয় (তৃতীয়বার), এক বছর আট মাস (ডিসেম্বর, ১৯৮৩ - জুলাই, ১৯৮৫) টিচার-ইন-চার্জের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় ১৯৮৫-র আগষ্টে স্থায়ীভাবে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন এবং ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ পর্যন্ত। তাঁর সময়ে সার্বিক ক্ষেত্রে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের অগ্রগতি ঘটে এবং সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে কিছুটা পরে পরবর্তী পর্যায়ে।

বিজয়কৃষ্ণবাবু এই কলেজে যোগদান করার আগের প্রায় পনেরো বছর এই কলেজের প্রশাসন ব্যবস্থার যে চিত্র ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে এখন পর্যালোচনা করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঐ সময়কালের মধ্যেই ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে কলেজে রজত জয়ন্তী (পঁচিশ বছর পূর্তি) ও পুনর্মিলন উৎসব পালিত হয় এবং ঐ উপলক্ষ্যে একটি ক্ষুদ্র আকারের স্মরণিকাও প্রকাশিত হয়।[১১] সেই সময় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র মাল মহাশয়। যাইহোক, ঐ স্মরণিকা সংখ্যার একটি কপি শ্রীযুক্ত প্রদীপ কুমার আঢ্য মহাশয় আমাকে প্রদান করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। এতে সমকালীন তিনজন অধ্যাপকের লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ প্রবন্ধগুলিতে উল্লেখিত বিষয়গুলি বিচার বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতেই ঐ সময়ে কলেজের সামগ্রিক একটি রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

আঁধার না থাকলে আলোর গুরুত্ব বোঝা যায় না। সমভাবে দুঃখ না থাকলে সুখ-সমৃদ্ধিকেও সেইভাবে উপলব্ধি করা যায় না। শ্রী শ্রী মা সারদার কথায় 'দুঃখ হল দয়ার দান'। এই সুপরিচিত নৈতিক ও বাস্তব কথাগুলি এখানে উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, আজ আমাদের গর্বের নেতাজী মহাবিদ্যালয় যে নানা পুষ্পে শোভিত ও নানা শাখায় পল্লবিত, যে মহাবিদ্যালয়ের অত্যুজ্জ্বল চিত্র ওয়েবসাইটে দেখে কলেজ সার্ভিস কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ের তালিকায় নথিবদ্ধ অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ বাড়ি থেকে দূরে হলেও এই কলেজে যোগদানের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে তার প্রকৃত অবস্থা কেমন ছিল তা অনুধাবন করা। উল্লেখ্য, নানা প্রতিকূল অবস্থা ও বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে কোনো ব্যক্তি বা দেশ যেমন একদিন সুদৃঢ়, সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুনামের অধিকারী হয়ে ওঠে, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটির ক্ষেত্রেও যে তার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি তা বোঝা সম্ভব হবে।

এখন এই মহাবিদ্যালয়ের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে একটি ক্ষুদ্র (২৫ পৃষ্ঠা) অথচ কলেজের সমকালীন ও প্রাক্ পরিস্থিতি সম্পর্কে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্য সমৃদ্ধ স্মরণিকা ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল মূলত তার উপর ভিত্তি করেই ঐ সময়ে কলেজের নানা ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। উল্লেখ্য, এই সংখ্যাটিতে তিনজন অধ্যাপকের লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, যাঁরা সকলেই ছিলেন এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। এঁরা হলেন স্বর্গীয় পীযূষকান্তি পাল (১৯৪৮-৫০), শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র মাল (১৯৫১-৫৪) এবং স্বর্গীয় মুরারীমোহন মান্না (১৯৫৪-৫৬)। এঁদের সকলের লেখার মধ্যেই পঁচিশ বছর বয়সে প্রতিষ্ঠানটির যে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য ছিল স্বাভাবিক ঘটনা তার অনুপস্থিতি বর্ণিত হয়েছে নানা উদাহরণ সহযোগে। এর পাশাপাশি অবশ্য এর সুনাম, শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সুমধুর সম্পর্ক, এর অন্তরের ঐশ্বর্য প্রভৃতি ইতিবাচক বিষয়গুলির ওপর জোর পড়েছে। প্রাসঙ্গিক অংশগুলি এখানে তুলে ধরলাম। 'পূর্ণর্মিলন উৎসব সমিতি'র 'নিবেদন' নামক অংশে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক পীযূষবাবু লিখেছেন, ''কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের বিভিন্ন শাখায় অজস্র ছাত্র-ছাত্রী জ্ঞান লাভ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন ... কিন্তু তাদের কেউই কি এই মহাবিদ্যালয়ের শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশ, খড়ের ক্লাসরুম, জোড়া আমগাছ, অধ্যাপক মহাশয়দের প্রাণঢালা ভালোবাসা ও সস্নেহ তিরস্কার - এসব ভুলতে পেরেছে? ... আমরা এখনও দেখব সেই আম্রবৃক্ষযুগল ও তার তলাকার বাঁধানো বেদী, সেই অসমাপ্ত গৃহ প্রভৃতি আরো অনেক কিছুই আগের মতন। কিন্তু আমাদের বিদ্যায়তনের মূল সুরটি এখনও একই রয়ে গেছে। ... আমরা বলীয়ান আমাদের অন্তরের ঐশ্বর্যে।''[২২]

প্রাক্তন আরো দুজন ছাত্র ও পরবর্তীকালে এই কলেজেরই অধ্যাপক, যাঁদের লেখা এই রজত জয়ন্তী সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁদের বক্তব্য আরো সুস্পষ্ট। শ্রদ্ধেয় দুলালবাবু লিখেছেন, ''বর্তমান শিক্ষাবর্ষে (১৯৭৩-৭৪) আমাদের মোট ছাত্র-ছাত্রী ১৫৯২ জন। এই অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি রেকর্ড। ... কলেজের এই

অগ্রগতি নিরঙ্কুশ ছিল না। পরিচালন ব্যবস্থায় বিরোধ ও বিচ্যুতি এবং এর ফলে দীর্ঘদিন এই কলেজ উন্নয়নমূলক যাবতীয় সরকারি অনুদান থেকে বঞ্চিত থাকায় কলেজের বৈষয়িক অগ্রগতি বারবার ব্যাহত হয়েছে। আমাদের অসমাপ্ত ঘর-বাড়ি, অপুষ্ট লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরি, দীন ছাত্রাবাস এবং অসম্পূর্ণ অধ্যাপক নিবাস এর প্রমাণ দেবে। শুধু ছাত্রদের বেতনের ওপর নির্ভর করে এই মহাবিদ্যালয় অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। ... ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মিলিত চেষ্টায় এই কলেজ পরিচালকহীন অবস্থায় দীর্ঘদিন চলেছে ও এখনও চলছে। বিচারাধীন সমস্যাগুলির সমাধান না হওয়া পর্যন্ত মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে মাননীয় মহকুমা শাসক এই কলেজের প্রশাসক হিসাবে বর্তমান কলেজের পরিচালন  ও উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত আছেন। কলেজের সীমিত সাধ্যের মধ্যে থেকেও গৃহসমস্যা ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। আশা ও আনন্দের কথা চরম আঘাতেও আমরা থেমে থাকিনি। উন্নতির অভিমুখে এগিয়ে চলেছি"।[২৩] স্বর্গীয় অধ্যাপক মুরারিমোহন মান্না 'দিনগুলি মোর রইল না' নামক প্রবন্ধে এই কলেজে তাঁর ছাত্রাবস্থা (১৯৫৪-৫৬) এবং অধ্যাপনা কালের প্রারম্ভিক পর্বে বিশেষ করে ১৯৬০-এর দশকের শেষ ও ১৯৭০-এর দশকের গোড়ায় কলেজের সার্বিক পরিস্থিতিকে বেশ মিঠেকড়া ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে - "একদিন ছাত্র হিসাবে এই কলেজকে যে সাত বছরের এক বালকরূপে দেখে গিয়েছিলুম, আজ (১৯৭৩) আঠারো বছর পরে সেই বালকের বয়স যদিও দাঁড়িয়েছে পঁচিশ, কিন্তু পঁচিশ বছরের এক পূর্ণ যুবকের যৌবনের উদ্দামতা, দেহের পুষ্টি ও লাবণ্য কই? অথচ আজ এর ছাত্রসংখ্যা প্রচুর, শিক্ষক সংখ্যাও কম নয়, অনেক বিষয়ে অনার্স কোর্স খোলা হয়েছে, তবু এর বাহ্যিক দৈন্য এমনই প্রকট যে, মনে হয় এই কলেজ এখনও অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছে। ... এই  কলেজ একদিন দরিদ্র মতেই ভূমিষ্ট হয়েছিল, কিন্তু দারিদ্র্যই কি পরিপূর্ণতার পথে একমাত্র অন্তরায়? নাকি নিদারুণ অভিশপ্ত ছিল এর জন্মলগ্নটাই? কে জানে! ... তবু একটা কথা ভেবে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য গর্ব হয় যে, নানা ক্লেশ ও কষ্টের মধ্যে দিয়েও এটি টিকে আছে এবং মহকুমার কলেজগুলির মধ্যে ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যার বহুলতায় অন্যতম বড় কলেজ বলে গণ্য হয়ে আছে - সে বোধকরি এর অন্তরের স্বাস্থ্য ও সম্পদের গুণে। আর সেই সম্পদ ও স্বাস্থ্যের উৎস হল এই কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের সম্মিলিত সাধনা ও সংগ্রাম"।[২৪]

## আট

কথায় আছে 'চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়'। ব্যক্তি, দেশ, প্রতিষ্ঠান - সমস্ত ক্ষেত্রেই একথা সত্য। আমাদের নেতাজী মহাবিদ্যালয়ও এর ব্যতিক্রম নয়। ওপরের আলোচনা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, অধ্যক্ষ স্বর্গীয় গুরুদাস সেন মহাশয়ের প্রশাসনিক দক্ষতার দরুণ কলেজের সামগ্রিক দিক যে শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাঁর পরবর্তী কয়েকজন উত্তরসূরী অধ্যক্ষ বিশেষ করে স্বর্গীয় অনিলবরণ দাস ও

স্বর্গীয় চিত্তপ্রিয় রায় মহাশয়গণের সময়ে এর ধারাবাহিকতা প্রায় বজায় থাকে। কিন্তু এঁদের সময়কাল অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর ১৯৭০-এর দশকের গোড়া থেকে উদ্ভুত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কলেজ পরিচালন ব্যবস্থায় সংকট সৃষ্টি হয়। পঠন পাঠনে খুব বেশি বিঘ্ন সৃষ্টি না হলেও অধ্যক্ষহীন অবস্থায় কলেজ পরিচালিত হতে থাকে। এই সংকটজনক পরিস্থিতির অবসান ঘটে নতুন করে কলেজে সমৃদ্ধির যুগ শুরু হয় ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের আগষ্ট মাসে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় এই মহাবিদ্যালয়ে যোগদানের পর থেকে। ২০০৩-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দীর্ঘ প্রায় আঠারো বছর ধরে তিনি কলেজের অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামো, সুশৃঙ্খল পঠন-পাঠন, খেলাধূলা, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনলস প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায় ১৯৬০-এর দশকের গোড়ায় তিনি নেতাজী মহাবিদ্যালয় থেকেই আই. এ. পাশ করেছিলেন।

সাম্প্রতিককালে বিজয়বাবু প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে, এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র স্থায়ী অধ্যক্ষ পদে যোগদান করার পরে পরেই কলেজের পূর্বতন বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ঘটিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক উন্নতি ঘটাতে আন্তরিকভাবে যত্নবান হয়ে ওঠেন। বিজয়বাবুর সময়কালে (আগষ্ট, ১৯৮৫- ফেব্রুয়ারি,২০০৩) কলেজের পঠন-পাঠন সংক্রান্ত আলোচনায় প্রবেশ করার আগে পুরানো বিল্ডিং-এর পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন বিল্ডিং নির্মাণ, পুরানো বিল্ডিং-এর দ্বিতল নির্মাণ, তথা পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত বলা যায়, এক্ষেত্রে পরিচালন সমিতির যোগ্য সহায়তা তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর আঠারো বছর অধ্যক্ষকালীন সময়ের বেশিরভাগ সময়টাই পরিচালন সমিতির সুযোগ্য দুই সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে অধ্যাপক স্বর্গীয় সুধীর রায় মহাশয় (বর্ধমানের সাংসদ) এবং আরামবাগের বিধায়ক স্বর্গীয় বিনয় দত্ত মহাশয়। উল্লেখ্য, এঁরা দুজন এবং পরিচালন সমিতির সমস্ত সদস্য ঐক্যবদ্ধভাবে অধ্যক্ষ বিজয়বাবুর ইতিবাচক গঠনমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

ইতিপূর্বে উল্লেখিত তৎকালীন কলেজ ক্যাম্পাসের পূর্বদিকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা পশ্চিমমুখী যে বিল্ডিং (ইউ. জি. সি. বিল্ডিং) টি অধ্যক্ষ স্বর্গীয় অনিলবরণ দাসের সময়ে একতলা (গ্রাউন্ড ফ্লোর) তৈরি হয়েছিল, বিজয়বাবু অত্যন্ত তৎপর হয়ে ইউ. জি. সি. (কলকাতা শাখা)-র সঙ্গে বারবার যোগাযোগ স্থাপন করে এর দ্বিতল (ফার্স্ট ফ্লোর)-এর কাজ সম্পন্ন করেন (১৯৮৮-৮৯)। সমকালীন অধ্যাপকদের কাছ থেকে জানা যায় যে, এটি নির্মাণের সময় একদিন স্থানীয় প্রায় সকল অধ্যাপক ও অফিসকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে সারারাত ধরে ছাদ ঢালাইয়ের কাজ তিনি পর্যবেক্ষণ করেন। কাজ শেষ হয়েছিল পরেরদিন সকাল ৮টায়। প্রসঙ্গত বলা যায় নবনির্মিত এই দোতলার দক্ষিণ প্রান্তের ঘরে (কিছুদিন আগেও যেখানে A. P. Section ছিল) বোটানি বিভাগের ল্যাবরেটরিকে সরিয়ে আনা হয়। এর আগে বোটানি বিভাগের প্রধানের চেম্বারসহ ক্লাসরুম ছিল

দক্ষিণ প্রান্তে অধ্যক্ষের চেম্বারের দোতলায় (এখন যেখানে গেস্ট হাউস)। ঐ নবনির্মিত দোতলার উত্তর প্রান্তের ঘরে জুলজি ল্যাবরেটরিকে স্থাপন করা হয় ( যা আজও বর্তমান)। মাঝের বাকি ঘরগুলি শ্রেণীকক্ষ হিসাবে ব্যবহার করা হয়, যা আজও ধারাবাহিক ভাবে চলছে। এর অল্প কয়েক বছর পর সেই সময় পশ্চিমদিকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা পূর্বমুখী পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিভাগের টিনের ছাউনি দেওয়া লম্বা ঘরটি (পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এই বিল্ডিংটাই বর্তমান নেতাজী মহাবিদ্যালয় ক্যাম্পাসের প্রথম বিল্ডিং, নির্মাণকাল ১৯৫০-৫১) ভেঙে তৈরি হয় একতলা পাকা বিল্ডিং। তাঁর সময়েই এর দ্বিতলের একটা বড় অংশ নির্মাণের কাজও সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য, এই দ্বিতলেই তিনি গ্রন্থাগারকে সরিয়ে আনেন তৎকালীন টিচার্স স্টাফ রুম-এর পাশ থেকে। এ ব্যাপারে দূরদৃষ্টির সাহয্যে রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তা লাভে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রদ্ধেয় বিজয়বাবু যখন এই কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান (আগষ্ট, ১৯৮৫) করেন, তখন পুরানো কলেজ ক্যাম্পাসের পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা দক্ষিণমুখী (এখন যেখানে বোটানি ডিপার্টমেন্ট অবস্থিত) একতলা একটি বিল্ডিংও ছিল। ঐ বিল্ডিং-এ ছিল (পূর্বদিক থেকে পশ্চিমে) টিচার্স রুম ও সংলগ্ন ক্যান্টিন, লাইব্রেরি এবং একটি কোণে ইউরিন্যাল। এই অবস্থা বজায় ছিল ১৯৯৩-এর ১ লা এপ্রিল তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজ থেকে সরে এসে এই কলেজে আমি যখন যোগদান করি এবং তারপরেও কিছুকাল আগেও যেসব সহকর্মী যোগদান করেছেন তাঁদের সময়েও। মাঝখানে কিছু সংযোজন হয়েছিল। যেমন - মহিলা শিক্ষক (অধ্যাপিকা)দের জন্য বসার আলাদা জায়গা ও কমনরুম। এমনকি পরবর্তী ও বর্তমান অধ্যক্ষ ড. অসীম কুমার দে মহাশয় যখন ২০০৩-এর ১ লা মার্চ যোগদান করেন তখন স্টাফরুম ঐ জায়গাতেই ছিল। যাক, যে কথা বলছিলাম ঐ বিল্ডিংটার (বর্তমান সায়েন্স বিল্ডিং - এ্যানেক্স) দ্বিতল নির্মাণের কাজ বিজয়বাবুই সম্পন্ন করে গিয়েছিলেন। উত্তরোত্তর ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে এই দ্বিতল নির্মাণ ছিল খুবই জরুরী। ঐ সময়েই বর্তমান বোটানি ডিপার্টমেন্টের সামনের জায়গাটিতে সাইকেল ও মোটর সাইকেল রাখার শেড তৈরি করা হয়েছিল প্রয়োজনের তাগিদে। দুর-দূরান্ত থেকে এই মহাবিদ্যালয়ে পড়াশোনারত ছাত্রীদের যাতে সুবিধা হয়, সেই উদ্দেশ্যে তাঁর সময়েই নির্মিত হয়েছিল গার্লস হোস্টেলের প্রথমতলা।

পরিকাঠামোগত উন্নয়নের আরো বেশকিছু কাজ করে গিয়েছিলেন বিজয়বাবু। অর্থসঙ্কটকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে স্থানীয় বিধায়ক ও সাংসদের এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ঠ মুন্সিয়ানা দেখিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, দ্বারকেশ্বর নদের বালি কিনে তিনি কলেজের বহুদিনের পুরানো ফুটবল মাঠের সংস্কার করেছিলেন। শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে মাঠের পশ্চিমদিকে কিছু অস্থায়ী কক্ষ নির্মাণ করিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কথা ভেবে ইউ. জি. সি. বিল্ডিং-এর পূর্বদিকের বিস্তৃত ফাঁকা ঢালু অংশ (যেখানে বর্তমানে কার পার্কিং, সুন্দর ফুলের বাগান, কেন্দ্রীয়

গ্রন্থাগার প্রভৃতি বর্তমান) নদীর বালি কিনে ভরাট করে সমতল করে রেখেছিলেন। এই সময়েই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক প্রণব কুমার দালাল ইউ. জি. সি. বিল্ডিং-এর পশ্চিমদিকে নেতাজী মূর্তির সামনে একটি মনোরম বাগান তৈরি করেছিলেন।

অধ্যক্ষ বিজয়বাবুর সময়কালে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি কলেজের পঠন-পাঠন তথা সার্বিক উন্নয়ন ঘটতে থাকে দ্রুতগতিতে। তাঁর সক্রিয় উদ্যোগেই চারটি বিষয়ে অনার্স কোর্স খোলা হয়। এগুলি হল - উদ্ভিদবিদ্যা (১৯৯৪), ইতিহাস (১৯৯৫), ভূগোল (১৯৯৬), ইংরাজী (১৯৯৬) ও পদার্থবিদ্যা (১৯৯৯)। এছাড়াও চালু হয় ভোকেশনাল কোর্স। শুধু তাই নয়, তাঁর সময়েই নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে দুটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় Study Centre বা পঠন-পাঠন কেন্দ্র চালু হয়। এগুলি হল যথাক্রমে নেতাজী সুভাষচন্দ্র মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (IGNOU)। এই দুটি কেন্দ্র পরিচালনার প্রাথমিক দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়েছিল যথাক্রমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক প্রণব কুমার দালাল এবং প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক তরুণ ঘটক-এর ওপর। অল্প কিছুকালের মধ্যেই এই পাঠকেন্দ্র দুটির প্রসার ঘটে, যার গতিধারা মাঝখানের কিছু সময় বাদ দিয়ে আজও অব্যাহত। কলেজেরই একটি কক্ষ (খুব সম্ভবত ১ বা ২ নং রুম)-য় নেতাজীর নামে 'নেতাজী মহাবিদ্যালয় ডাকঘর' প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিজয়বাবুর উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে।[২৫] তাঁরই প্রচেষ্টায় আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত কলেজের নিজস্ব প্রেস 'বর্ণমালা' গতিশীল হয়ে ওঠে, যার অস্তিত্ব আজও বর্তমান।

এখন অধ্যক্ষ ও প্রশাসক বিজয়বাবু এবং মানুষ বিজয়বাবু সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে। অধ্যক্ষ হিসাবে কলেজের পঠন-পাঠন তথা সার্বিক উন্নতি সাধন করা ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের তিনি নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে সমবসময় আবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করতেন। অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা ঠিকমতো ক্লাসে যাচ্ছেন কিনা, ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসে উপস্থিত থাকছে কিনা - এসব বিষয়ে তিনি যথার্থ অর্থে নজরদারের কাজ করতেন। নিজ কক্ষে সব সময় বসে না থেকে মাঝে মাঝেই ক্লাস রুমের পাশ দিয়ে করিডরে ঘুরতে বেড়িয়ে পড়তেন। বেশিরভাগ দিনই সকাল ১১টায় এবং কলেজ ক্যাম্পাসের একেবারে দক্ষিণদিকে তাঁর রেসিডেন্স (কলেজ কোয়ার্টার) থেকে লাঞ্চ সেরে দুপুরের দিকে স্টাফরুমে চলে আসতেন। এরফলে একদিকে যেমন অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সঙ্গে সাধারণ ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা চলত, তেমনি এর পাশাপাশি তাঁরা নিজ নিজ ক্লাসে ঠিক সময়ে যাচ্ছেন কিনা সেই বিষয়টাও সম্ভবত একধরণের নজরদারি করা হয়ে যেত। বলা বাহুল্য, রাশভারি, গাম্ভীর্যপূর্ণ অধ্যক্ষের হঠাৎ করে উপস্থিতি অকপটে শিক্ষকদেরও ক্লাস সম্পর্কে সচেতন করে তুলত। স্বাভাবিক ভাবেই কলেজে নিয়মানুবর্তিতার সাথে সাথে পড়াশোনার এক মনোরম পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। মহকুমার অন্যান্য কলেজের সঙ্গে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের মুল পার্থক্য এখানেই। উল্লেখ্য, এই ধারা এখনও অনেকাংশেই

বহমান। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর এখনও প্রতিবছর ছাত্র-ছাত্রীদের একটা বড় অংশ প্রথমে এই কলেজে ভর্তির সুযোগ নেয়। ব্যর্থ হলে তারা মহকুমার অন্যান্য কলেজে ভর্তি হয় বাধ্য হয়ে। কয়েকটি বিষয় বা বিভাগের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তাঁর সময়ে কলেজের নিয়মানুবর্তিতার যে কথা বলছিলাম, সেই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করতেই হবে যে, শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে বারবার গঠনমূলক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আমলেই এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম 'পাঁচ দিন পাঁচ ঘন্টা' ক্লাস তথা কলেজে শিক্ষকদের পাঁচ ঘন্টা থাকার সরকারি নিয়মটি চালু হয়। উল্লেখ্য, ছাত্র স্বার্থের কথা বিবেচনা করে অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তকে মান্যতা দেন। এছাড়া, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট-বড় যে কোনো পরীক্ষাই হোক না কেন তিনি অন্তত একটিবার কক্ষে ঢুকতেন এবং ২/১ মিনিট থেকে বেরিয়ে পড়তেন। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে যথেষ্ট ইতিবাচক দিক ছিল। প্রশাসনের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট দিন (শুক্রবার ও শনিবার)-এ তিনি ইতিহাস (সাম্মানিক)-এর দুটি ক্লাস নিতেন ও সিলেবাসের নির্দিষ্ট অংশ শেষ করতেন। মাঝে মাঝেই লাইব্রেরি থেকে বই তুলতেন। অবসরের পরেও মাঝে মাঝে তিনি 'জাতীয় গ্রন্থাগার'-এ যেতেন। আরামবাগ  পৌরসভা, এখানের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রভৃতি কয়েকটি গবেষণামুলক প্রবন্ধের সমন্বয়ে একটি গ্রন্থও তিনি লিখেছিলেন তাঁর জীবদ্দশার শেষ দিকে। এমনকি ইতিহাস (পাস কোর্স)-এর প্রধান পরীক্ষকও ছিলেন তিন বছরের অধিককাল। উল্লেখ্য, তখনও এখানে ইতিহাস (সাম্মানিক) চালু হয়নি।

বিজয়বাবুর সময়ের আরো দু-তিনটি ইতিবাচক দিকের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে। উল্লেখ্য, তিনি কলেজে যোগদানের পর থেকেই একটি নতুন প্রথা চালু হয় এবং তা হল প্রতিবছর ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে অধ্যক্ষ ও তাঁর পরিবার সহ কলেজের সমস্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ কর্তৃক স্বপরিবারে প্রসিদ্ধ কোনো পিকনিক স্পটে (দূরে বা কাছে) মিলিত হওয়া। এটা ছিল সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির কাছে যেন একটা উৎসবের দিন। এই ধারা এখনও প্রবহমান। এছাড়া সমাজসেবামূলক বেশ কিছু কাজে তিনি যুক্ত ছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায় নেতাজী মহাবিদ্যালয় ও এই এলাকার আরো বেশকিছু শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পালের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ''ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল স্মৃতিরক্ষা সমিতি' গঠিত হয় এবং আমৃত্যু তিনি এর সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সময়ে এই কলেজের এন. এস. এস. বিভাগ যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। এক্ষেত্রে প্রয়াত অধ্যাপক নিখিলচন্দ্র রায়ের অবিসংবাদী ভূমিকা ছিল। আর তার অনেক আগে থেকেই এন. সি. সি. বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছিল।

অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় এই কলেজে যোগদানের পর প্রথম আট-দশ বছর কলেজের শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালোই ছিল। তাঁর অভ্যন্তরের জেদী মানসিকতার তখন খুব বেশি বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। কিন্তু পরের দিকে প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজকর্মে তিনি বড়ই একরোখা হয়ে ওঠেন এবং বেশকিছু ক্ষেত্রেই তিনি

'অহেতুক অনমনীয়' মনোভাব পোষণ করতেন। ফলে শিক্ষক স্বার্থ সংক্রান্ত নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে শিক্ষকদের মতবিরোধ ঘটে। অনেক সময় এর সমাধানের জন্য গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট স্বর্গীয় বিনয় দত্ত মহাশয়কেও হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। পরে সমাধানও হয়েছে। তবে এরজন্য কলেজের পঠন-পাঠনের মনোরম পরিবেশে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি। ২০০৩-এর ফেব্রুয়ারিতে তাঁর অবসরের পর ধীরে ধীরে সমস্ত মনান্তর দূরীভূত হয়েছে। যেটা স্থায়ী হয়ে আছে এবং সম্ভবত থাকবেও তা হল তাঁর সময়ে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুবর্তিতা ও কলেজের পঠন-পাঠনের সুন্দর পরিবেশ।

## নয়

এখন পর্যন্ত নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসে অধ্যক্ষ পদে সবচেয়ে বেশিদিন যিনি অধিষ্ঠিত আছেন তিনি হলেন ড. অসীম কুমার দে মহাশয়। তিনি এই পদে যোগদান করেন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের অবসরের পরের দিন, ১লা মার্চ, ২০০৩। অর্থাৎ কুড়ি বছরেরও অধিককাল। জন্মাবধি তিনি আরামবাগের অধিবাসী। এই কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগদানের আগে তিনি হুগলী জেলারই চাঁপাডাঙ্গা রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায় বিজয়বাবু অবসর গ্রহণের কিছুদিন আগেই অধ্যক্ষের ঘর ও অফিস শিক্ষকদের স্টাফরুম (এখন যেখানে বোটানি বিভাগ)-এর পাশে স্থানান্তরিত করে যান। ড. অসীম কুমার দে এই নতুন ঘরেই অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বস্তুত ২০০৩ সালের ১লা মার্চ তারিখটি নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। স্মরণীয় এই কারণে নয় যে, তিনি ঐ তারিখে যোগদান করেছিলেন বলে। স্মরণীয় এই কারণে যে তাঁর যোগদানের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিকভাবে যে সব অভাবনীয় উন্নতি বা সমৃদ্ধি ঘটেছে তার সূচনাকাল ছিল ঐ তারিখটি। আর এ কথা সর্বাংশে সত্য যে রাতারাতি কোনো পরিবর্তন ঘটে না - ধীরে ধীরে অথচ সুপরিকল্পিতভাবে পরিবর্তনগুলি ঘটে যায় সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে। একটা কথা অবশ্য নিঃসংকোচে বলা যায় যে, তাঁর পূর্বতন অধ্যক্ষ স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় (আগস্ট, ১৯৮৫ – ফেব্রুয়ারি, ২০০৩) কলেজের এক অভ্যন্তরীণ সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে যোগদান করে সামগ্রিক ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটিকে একটি ভদ্রস্থ ও স্থিতিশীল জায়গায় এনে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে নিয়ম শৃঙ্খলা ও পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে। পরিকাঠামোগত সার্বিক উন্নয়ন তিনি করে যেতে পারেন নি। বেশ কিছু ক্ষেত্রে অভিনবত্ব আনার চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য তাঁর অবসরের সময়ে কলেজের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। নতুন অধ্যক্ষ অসীম কুমার দে মহাশয় তাঁর দূরদৃষ্টি, পুরানো কলেজ (চাঁপাডাঙ্গা মহাবিদ্যালয়)-এ লব্ধ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ও বাস্তব বুদ্ধির সাহায্যে পূর্বতন অধ্যক্ষের শুরু করা অসমাপ্ত কাজগুলি শুধু দক্ষতার সাথে সমাপ্ত করেছেন তাই নয়, বেশকিছু নতুন এমনকি কিছু ঝুঁকিপূর্ণ পরিকল্পনা হাতে নিয়ে দীর্ঘ কুড়ি বছরের অধিককাল ধরে একের পর এক কাজ সমাপ্ত করে

চলেছেন। কলেজের পুরানো প্রবেশপথ (যে পথ দিয়ে উনি এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন) টাই শুধু পাল্টে দেননি - সামগ্রিকভাবে কলেজের পরিকাঠামোটাকেই বদলে দিয়েছেন এবং অবশ্যই পুরানো স্মৃতিচিহ্নগুলিকে যথাসম্ভব অক্ষত রেখে।

ড. অসীম কুমার দে'র অধ্যক্ষকালীন সময়ে (মার্চ, ২০০৩ -২০২৩) নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের যে সমস্ত উন্নয়নমূলক (পরিকাঠামোগত ও পঠন-পাঠনগত) কাজকর্ম সম্পন্ন হয়েছে সেগুলির আলোচনায় প্রবেশের আগে দুটি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে উল্লেখ করে নেওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। প্রথমেই যেটা উল্লেখ করতে চাই তা হল, আমার সমবয়সী অধ্যক্ষ অসীমবাবুর সময়ে কলেজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার প্রয়োগ। বাণিজ্য বিষয়ের অধ্যাপক এবং ম্যানেজমেন্টের ওপর ডক্টরেট ড. দে যথার্থই অনুভব করেন যে, কোনো প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে এই ধরণের শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতি ঘটাতে গেলে বিভিন্ন কমিটি গঠন করে এবং যোগ্য ব্যক্তির ওপর কয়েকজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত সেই কমিটি পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পন করলে তিনি নিজ লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবেন। এক্ষেত্রে তাঁর বড় কৃতিত্ব হল এই যে, তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট কমিটির দায় বহনের ভার যোগ্য ব্যক্তির ওপরেই ন্যস্ত করতেন, যার ফলে সাফল্য লাভ ছিল অবশ্যম্ভাবী। অপ্রিয় হলেও সত্যি যে, তাঁর পূর্বতন অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের মধ্যে এই বিকেন্দ্রীকরণ মনোভাবের যথেষ্ট অভাব ছিল। দ্বিতীয় যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে চাইছি তা হল, অসীমবাবুর আগে থেকেই এই কলেজে শিক্ষা ও শিক্ষাকর্মী (Teaching and Non-teaching staff) বন্ধুদের অনেকেই ছিলেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ ও কাজের লোক। অসীমবাবুর পক্ষে এই বিষয়টি যথেষ্ট শুভপ্রদ হয়েছিল। এদিক থেকে তাঁর ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। তিনি নিজে একজন নিষ্ঠাবান, কর্মোদ্যোগী ও ভদ্র মানুষ হওয়ার সুবাদে সত্যিকারের যোগ্য মানুষদের সহযোগিতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নতুবা তাঁর একার পক্ষে সার্বিক দিক থেকে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের আজকের এই অভাবনীয় অগ্রগতিকে বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব হত না। অর্থাৎ আমি যা বলতে চাইছি তা হল, চালক গাড়ি চালান ঠিকই, কিন্তু চাকা, ব্রেক, নাট-বল্টু, হর্ন প্রভৃতি ঠিকঠাক না থাকলে গাড়ি চলে না। চালককে মাথা ঠাণ্ডা রেখে অভিভাবকের ন্যায় প্রয়োজনমতো মিঠা-কড়া মনোভাব নিয়ে চলতে হয়। আমাদের প্রিয় মহাবিদ্যালয়ের বর্তমান অধ্যক্ষের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে সত্য।

এখন আসা যাক তাঁর কুড়ি বছরেরও অধিক সময়কালে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে আলোচনায়। বেশ কিছু ক্ষেত্রে ড. দে কলেজের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এখানে মূল বিষয়গুলিকে সংক্ষেপে যতটা সম্ভব পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করার চেষ্টা করছি। প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ হল বর্তমান কলেজের খেলার মাঠের পশ্চিমদিকে খড়ের ছাউনি দেওয়া যে ছোট ছোট ঘর

ছিল (যেখানে একসময় আমরা ক্লাস নিয়েছি) সেগুলিকে ভেঙ্গে সুদৃশ্য 'বিজয় মোদক ভবন' নির্মিত হয়। প্রথমে একতলা (গ্রাউন্ড ফ্লোর) এবং অল্পকালের মধ্যেই এটি ত্রিতলে পরিণত হয় (২০০৪-২০০৬)। এক্ষেত্রে তাঁকে মানসিক দিক থেকে নিরন্তর সাহস যুগিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের খুব কাছের মানুষ প্রয়াত নিখিলচন্দ্র রায় (রসায়ন বিভাগ) এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এম. এল. এ. ল্যাড থেকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন আরামবাগের বিধায়ক এবং কলেজের গভর্নিং বডির তৎকালীন সভাপতি প্রয়াত বিনয় দত্ত মহাশয়। অধ্যাপক পরমার্থ ঘোষও এক্ষেত্রে নিজেকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। উল্লেখ্য, বর্তমানে এই ভবনেরই বিভিন্ন তলে অবস্থিত ফিজিক্যাল এডুকেশন বিভাগ, জল পরীক্ষা কেন্দ্র, উন্নতমানের জিম, বাণিজ্য বিভাগ, বাংলা বিভাগ, কম্পিউটার সায়েন্স ও বি. সি. এ. বিভাগ। এর পরে পরেই প্রশাসনিক ভবন (সম্পূর্ণ নতুন) নির্মাণের কাজ শুরু হল এবং দু-তিন বছরের মধ্যেই দ্বিতল ও ত্রিতল বিল্ডিং নির্মাণ সম্পন্ন হল। এই বিল্ডিং-এর নীচের তলায় অবস্থিত ম্যাথামেটিক্স ডিপার্টমেন্ট, সুবিশাল ক্যান্টিন, এন. সি. সি., নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র দুটি অধ্যক্ষ বিজয়বাবুর আমলে চালু হলেও মাঝখানে এগুলির গতিশীলতা বিঘ্নিত হয়েছিল। বর্তমান অধ্যক্ষ অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সুযোগ্য অধ্যাপকদের (যথাক্রমে প্রয়াত ড. হরেকৃষ্ণ সামন্ত ও ড. পরমার্থ ঘোষ) ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করে এই দুটি কেন্দ্রে গতিশীলতা ফিরিয়ে আনেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, বর্তমানে উপাধ্যক্ষ ড. বিশ্বনাথ গরাই-এর নেতৃত্বে IGNOU এবং ড. তিলকনাথ ঘোষের নেতৃত্বে NSOU কেন্দ্র দুটি বেশ সুনাম অর্জন করেছে। দ্বিতলে অবস্থিত সুবিশাল কলেজ অফিস, অধ্যক্ষের ঘর, শিক্ষকদের স্টাফরুম (বসার জায়গা) ও ভাইস প্রিন্সিপ্যালের কক্ষ। ত্রিতলে অবস্থিত ইতিহাস বিভাগ এবং কলেজের গর্ব বৃহত্তর অডিটোরিয়াম। এরপর আসা যাক 'হেরিটেজ বিল্ডিং' প্রসঙ্গে। এই নামকরণের প্রধান কারণ হল কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে পরেই ১৯৫০-১৯৫১ সালে নির্মিত এটাই প্রথম পাকাবাড়ি, যা ছিল তখন দ্বিতল বিশিষ্ট। কলেজ ক্যাম্পাসের ভিতরে পূর্ব পশ্চিমে লম্বা দক্ষিণমুখী এই বিল্ডিংটিতে একসময় প্রিন্সিপ্যালের কক্ষ, কলেজ অফিস, শিক্ষকদের স্টাফরুম, গ্রন্থাগার মাঝখানে কিছুকাল ক্লাসরুম (টি. ভি. রুম) প্রভৃতি ছিল। অসীমবাবু এই বিল্ডিংটির ভগ্নদশা লক্ষ্য করে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে বারবার আলোচনা করে এর পুরানো ভিত (অস্তিত্ব) বজায় রেখে একে ত্রিতলে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা নেন ও সফল হন। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে সেই সময়ে কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি, অন্যান্য সদস্যারা এবং এ ব্যাপারে আগ্রহী বেশ কিছু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বন্ধু অধ্যক্ষকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন। বর্তমানে এই ভবনটির একতলায় ছাত্রীদের কমনরুম, ছাত্র ইউনিয়নের অফিস, ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে চীপ স্টোর, দ্বিতলে সুদৃশ্য ও অত্যাধুনিক গেস্ট হাউস, সাঁওতালি বিভাগ ও আই. কিউ. এ. সি. (IQAC) অফিস এবং সর্বোচ্চ তলে অবস্থিত বি. বি. এ. (B.B.A.) বিভাগ ও বেশ

কয়েকটি শ্রেণীকক্ষ।

কলেজ ক্যাম্পাসে ১৯৫০-৫১ সালে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা পুর্বমুখী টিনের ছাউনি দেওয়া ও সর্বপ্রথম সাদামাটা যে ভবনটি তৈরি হয়েছিল আজ সেটি বৃহত্তর ত্রিতল বিল্ডিং। বর্তমানে এটি 'বিজ্ঞান ভবন' নামে পরিচিত। যদিও আর্টস-এর কয়েকটি বিভাগও এই ভবনে অবস্থিত। এর প্রথম ও দ্বিতীয় তলের বেশির ভাগটাই বিজয়বাবুর সময়কালে নির্মিত হয়েছিল। ঐ দুটি তলের কিছু অংশ এবং ত্রিতলের সম্পূর্ণ অংশ তৈরি হয় অসীমবাবুর আমলেই। বর্তমানে এই ভবনের নীচের তলায় পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, রসায়ন বিভাগের ল্যাবরেটরি, দ্বিতীয়তলে পদার্থবিদ্যা বিভাগ, প্ল্যান্ট প্রোটেকশন বিভাগ, অর্থনীতি বিভাগ, সঙ্গীত বিভাগ ও ছাত্রীদের আধুনিক কমনরুম; তৃতীয়তলে শিক্ষা বিভাগ ছাড়াও রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃত বিভাগ এবং বেশকিছু শ্রেণীকক্ষ অবস্থিত। এই বিজ্ঞান ভবনের সঙ্গে সংযুক্ত পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা দক্ষিণমুখী ভবনটি সাধারণভাবে 'বিজ্ঞান ভবন সংযোজন' (Science Building - Annex) নামে পরিচিত। এর প্রথম ও দ্বিতীয় তলটি যথাক্রমে অধ্যক্ষ অনিল বরণ দাস ও অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের সময়ে নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু ত্রিতলটি স্মপূর্ণরূপে নির্মিত হয়েছিল অধ্যক্ষ অসীম কুমার দে এবং পরিচালন সমিতির উদ্যোগে। এই ভবনটির নীচের তলায় বিস্তৃত অংশ জুড়ে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ এবং দ্বিতল ও ত্রিতলে প্রধানত বিজ্ঞান বিভাগের শ্রেণীকক্ষ অবস্থিত। পশ্চিমমুখী U.G .C. বিল্ডিং-এর তিনি সংস্কার সাধন করেন। শুধু তাই নয়, এই ভবনের ত্রিতল সম্পূর্ণরূপে নির্মিত হয় তাঁর সময়েই, যেখানে আজ ইংরাজি বিভাগ (দক্ষিণ দিকে) এবং ভূগোল বিভাগ (উত্তর দিকে) অবস্থিত। এটি তৈরি হবার পর শ্রেণীকক্ষের সমস্যার পূর্ণ সমাধান হয়। এছাড়া কলেজে সামগ্রিকভাবে মোট এগারোটি অত্যাধুনিক ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষ, আধুনিক ল্যাবরেটরি, উন্নত ইন্টারনেট ব্যবস্থা প্রভৃতি রয়েছে। প্রতিটি বিভাগের সঙ্গে সত্বর যোগাযোগ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে প্রধানত দ্বিতল ও ত্রিতলে একটি ভবনের সঙ্গে অন্যান্য ভবনগুলিকে সংযুক্ত করা হয়েছে, যা অধ্যক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক। প্রসঙ্গত বলা যায় টিচার্স স্টাফরুম ছাড়াও কলেজে বর্তমানে মোট একুশটি বিষয়ে সাম্মানিক এবং তিনটি বিষয়ে পাসকোর্সের জন্য পৃথক পৃথক বিভাগ রয়েছে। এরফলে বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের সরাসরি যোগাযোগ থাকায় পঠন-পাঠনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।[২৬]

মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকে মোট চারবার স্থান পরিবর্তন করে গ্রন্থাগার এখন সম্পূর্ণ একটি পৃথক ভবন। এটি চতুর্থতল বিশিষ্ট একটি বৃহত্তর বিল্ডিং। ত্রিতলের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল ২০১৪-২০১৫য়। এই বৎসর সম্পূর্ণ হল চতুর্থতল এবং বাস্তব প্রয়োজনের কথা ভেবে এখানে তৈরি হয়েছে একটি বৃহৎ নাট্যমঞ্চ। বলা বাহুল্য, এই স্বয়ং সম্পূর্ণ ভবনটি নির্মাণের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ অসীমবাবু, গভর্নিং বডির সভাপতি ও প্রাক্তন

ছাত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা মহাশয় এবং অন্যান্য মাননীয় সদস্যদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটির পরিবেশ বেশ স্নিগ্ধ ও মনোরম। এখানে ষাট হাজার পুস্তক, ম্যাগাজিন, বেশকিছু পত্র-পত্রিকা, মিউজিয়াম, পুঁথিপত্র, বেশ কয়েকটি কম্পিউটার, জেরক্স মেশিনের সমন্বয়ে আধুনিক ব্যবস্থায় সুসজ্জিত গ্রন্থাগার অবস্থিত। গ্রন্থাগারিকদ্বয় ও অন্যান্য সহকর্মীদের সহৃদয় ব্যবহারের দরুণ শুধু বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরাই নন, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষালাভে আগ্রহী আরামবাগ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষও এখানে আসেন জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে।[২৭] ঐ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে মোট ২৪টি ডিপার্টমেন্ট (২১টি অনার্স ও ৩টি পাস কোর্স)-এ পৃথক পৃথক বিভাগীয় গ্রন্থাগার আছে। শুধু গ্রন্থাগার নয়, এই মানবিক পরিকাঠামো (human infrastructure) কলেজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমভাবে বিরাজমান। প্রসঙ্গত বলা যায়, অধ্যক্ষ মহাশয়ের সক্রিয় উদ্যোগ, পরিচালন সমিতি, বিশেষ করে সভাপতি মহাশয়ের মানবিক মূল্যবোধ এবং স্থানীয় মানুষজন, কলেজের কিছু অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীবন্ধুদের সাহচর্যে বর্তমান কলেজ গেটের বিপরীতে জমি ক্রয় করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের গর্বের বিষয় সেখানেই এ বছর সম্পন্ন হতে চলেছে 'প্লাটিনাম জুবিলি ভবন', যেখানে অল্পকালের মধ্যেই স্থানান্তরিত হবে নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সহ আরো কয়েকটি বিভাগ।

প্রবন্ধের কলেবর অযথা বৃদ্ধি না করে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন (২০০৩-২০২৩) সম্পর্কে সংক্ষেপে আর কয়েকটি অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সেগুলির অবস্থান উল্লেখ করছি মাত্র। দুটি ছাত্রাবাস ও একটি বৃহৎ ছাত্রীনিবাস (নজরুল ছাত্রীনিবাস) এবং আদিবাসী ছাত্রীদের জন্য নিবেদিতা ছাত্রীনিবাস (খেলার মাঠের দক্ষিণদিকে)-এর কথা প্রথমেই উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় হবে। নজরুল ছাত্রীনিবাসটি মহাবিদ্যালয়ের উত্তরদিকে ত্রিতল বিশিষ্ট একটি পৃথক ভবন। এটি নির্মিত হয়েছিল পূর্বতন অধ্যক্ষ বিজয়বাবুর সময়ে। বর্তমান অধ্যক্ষ এর সম্প্রসারণ ঘটিয়ে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সংস্কার সাধন করেন। পাশ্ববর্তী কিছু জমি ক্রয় করে পুরানো বিদ্যার্থী ভবন ছাত্রাবাসটি অসীমবাবুর সময়ে প্রায় পুনর্নির্মিত হয় এবং একে বিশেষভাবে সম্প্রসারিত করা হয়। দ্বারকেশ্বর নদের ধারে দ্বিতল বিশিষ্ট বিদ্যাসাগর ছাত্রাবাস সম্পূর্ণ নতুনভাবে নির্মিত হয় বর্তমান অধ্যক্ষের আমলেই। উল্লেখ্য, ছাত্র ও ছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট হোস্টেলের সুপার ও দূরবর্তী এলাকার অধ্যাপিকা (নজরুল ছাত্রীনিবাস) এবং অধ্যাপকদের (বিদ্যাসাগর ছাত্রাবাস) থাকার সুবন্দোবস্ত আছে। স্বাভাবিকভাবেই পৃথক টিচার্স কোয়ার্টার এর প্রয়োজন হয়নি। সুদৃশ্য ও সুবৃহৎ (দ্বিতল বিশিষ্ট) ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্স (ইউ. জি. সি.)টি নির্মিত হয়েছে সাম্প্রতিক কালেই। এর নীচের তলায় জিম (ছাত্র ও ছাত্রীদের) এবং শারীর শিক্ষার জন্য কিছু উন্নতমানের শ্রেণীকক্ষ অবস্থিত। আর দোতলায় যোগব্যায়াম ও ইনডোর খেলাধূলার সুন্দর ব্যবস্থা বর্তমান। এখানে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় হবে যে, প্রতিটি ক্যাম্পাস (প্রধান কলেজ ক্যাম্পাস, ছাত্রীনিবাস,

ছাত্রাবাস, স্পোর্টর্স কমপ্লেক্স প্রভৃতি) প্রাচীর দ্বারা সুবেষ্টিত।

পরিকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন ছাড়াও ২০০৩ সাল থেকে বিভিন্ন দিকে মহাবিদ্যালয়ের অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে, যেগুলির ওপর অতিসংক্ষেপে নীচে আলোকপাত করলাম। প্রথমেই যেটা উল্লেখ করব তা হল কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ, শিক্ষাকর্মীবন্ধুগণ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক সুন্দর হার্দিক সম্পর্ক। কলেজের কোনো বড় অনুষ্ঠান, পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা অথবা হঠাৎ কোনো অন্তর্জনের কোনো ধরণের সমস্যার সৃষ্টি হলে সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়েন নিঃসংকোচে। আজকাল বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র আন্দোলনের ফলে কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে যে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে থাকে নেতাজী মহাবিদ্যালয় তার থেকে মুক্ত। কারণ কোনো বিষয়ে ছাত্রদের মধ্যে কোনো অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে অথবা বিক্ষোভ হতে পারে অনুভব করে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অধ্যক্ষ মহাশয় আগে থেকেই ঠাণ্ডা মাথায় তার সমাধান করে নেন। এ ব্যাপারে কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি, শান্ত, নম্র, মিষ্টভাষী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা মহাশয়ও নির্দ্বিধায় এগিয়ে আসেন। ফলে কলেজে শান্তির পরিবেশ প্রায় সর্বদাই বজায় থাকে। অসীমবাবুর অধ্যক্ষকালীন সময়েই দুবার যথাক্রমে ২০০৭ ও ২০১৫ সালে এই প্রতিষ্ঠানে NAAC-এর মূল্যায়ন হয়েছে। প্রথমবার Co-ordinator ছিলেন ড. পরমার্থ ঘোষ (বর্তমানে অধ্যক্ষ, এ. কে. পি. সি. মহাবিদ্যালয়, বেঙ্গাই) এবং দ্বিতীয়বার Co-ordinator ছিলেন অধ্যাপক উদয় নন্দী (বিভাগীয় প্রধান, ইংরাজি)। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি উল্লেখ করার মতো, তা হল দুটি ক্ষেত্রেই শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের অনলস প্রচেষ্টা - সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী কলেজের উন্নতিসাধনে প্রায় সবটাই উজাড় করে দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, সবার ওপরে ছিলেন প্রধান কাণ্ডারী ড. অসীমকুমার দে, যিনি সর্বদা ভালোবাসার ডালি নিয়ে অফুরন্ত উৎসাহ জুগিয়ে গিয়েছিলেন। এই বিষয়ে বিশেষ করে ২০১৫ সালে NAAC-এর মূল্যায়ন পর্বে ড. বিশ্বনাথ গরাই (বর্তমান উপাধ্যক্ষ ও তৎকালীন পরিচালন সমিতির শিক্ষক প্রতিনিধি) ড. তিলকনাথ ঘোষ (তৎকালীন পরিচালন সমিতির শিক্ষক প্রতিনিধি), ভ্রাতৃপ্রতিম শিক্ষক রামানুজ মুখোপাধ্যায় সহ বেশকিছু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এই সংখ্যায় অধ্যাপক উদয় নন্দীর লেখা (৭৫ এ পা ঃ দ্বারকেশ্বরের জলতরঙ্গে)-য় থাকায় পুনরুল্লেখ করলাম না। যাইহোক দুটি ক্ষেত্রেই NAAC-এর মূল্যায়নের ফল সন্তোষজনক হয়েছিল।

অসীমবাবু অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদানের পর থেকেই কলেজে সেমিনার / কনফারেন্স (জাতীয় ও রাজ্যস্তরে)-এর বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। প্রথম কনফারেন্সটির শিরোনাম ছিল 'Human Rights and Human Development in India' (UGC Sponsored, State level)। এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল নবনির্মিত বি. এম বিল্ডিং-এর একতলায়, ২০০৪ সালের ১৪ ও ১৫ অক্টোবর তারিখে। ঐ ধারা পূর্ণোদ্যমে বজায় ছিল ২০১৮-২০১৯ পর্যন্ত। এখনও বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক সেমিনার / কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় সম্পূর্ণ

কলেজের উদ্যোগে এবং সরকারি অনুদান ছাড়াই। ছাত্র-ছাত্রীদের বাস্তব জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে বর্তমান অধ্যক্ষ মহাশয় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত এবং অন্তর্ভুক্ত নয় এমন বিভাগ সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদেরও শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেন, যার ধারা আজও বহমান। বর্তমান চরম বেকারত্বের যুগে পড়াশোনার সমাপ্তি পর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট উদ্যোগী। এ ব্যাপারে গ্রন্থাগারিক ড. বাসুদেব অধিকারী ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক ড. বাণেশ্বর কাপাসী (বর্তমানে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)-র ওপর Career Counselling Cell-এর দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন। বর্তমানে অধ্যক্ষ মহাশয়ের সক্রিয় উদ্যোগ এবং বাসুদেববাবুর তৎপরতায় কলেজে আয়োজিত Off Campus ও On-Campus প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রতি বছর বেশকিছু ছাত্র-ছাত্রীর কর্মসংস্থান হচ্ছে এবং তাদের অনেকেই নিজ নিজ প্রতিভা ও দক্ষতার দরুণ ইতিমধ্যেই বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষকদের জার্নাল 'FOCUS'-এর প্রকাশনা (UGC approved)-র সূচনার ক্ষেত্রেও বর্তমান অধ্যক্ষের অবদান অনস্বীকার্য। নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রসঙ্গে 'এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি'র কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্বতন অধ্যক্ষ বিজয়বাবুর সময়ে এটি চালু হলেও এ ব্যাপারে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ অসীমবাবু কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের আন্তরিক সহযোগিতায় একে সতেজ ও সজীব করে তোলেন। কলেজ প্রাঙ্গনকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করে তুলতে বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধূলা প্রভৃতির পাশাপাশি সুন্দর ফুলবাগান, আমবাগান প্রভৃতি তৈরি করা হয়েছে। সর্বোপরি বর্তমান পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক ভবনের সামনে একটি সুবৃহৎ Car Parking এলাকা গঠন করা হয়েছে।

## দশ

এতক্ষণ যে আলোচনা করা হল তা হল সূচনাকাল থেকে ২০২৩ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সাধারণভাবে আমাদের সকলেরই কমবেশি ধারণা হল 'অতীত ঘটনা'ই হল ইতিহাস (যদিও সব অতীতই ইতিহাস নয়)। আপাতদৃষ্টিতে কথাটি ভুল নয়। কিন্তু যদি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে ঐ সরলীকরণ যথার্থ নয়। আসলে অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে বর্তমানকালে এমনকি ভবিষ্যতেও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বারবার আলোচনা, সমালোচনা, বিতর্ক প্রভৃতির মধ্যেই নিহিত থাকে প্রকৃত ইতিহাস।[২৮] সুতরাং বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া তথ্য (লিখিত ও মৌখিক)-র ওপর ভিত্তি করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমাদের প্রিয় মহাবিদ্যালয় সম্পর্কে যে বর্ণনা আমি ওপরে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে তুলে ধরলাম তাকে নিঃসংকোচে 'ধ্রুব সত্য' বলে মেনে নিলে তা হবে ইতিহাসের প্রতি অবিচার। ভবিষ্যতের কোনো গবেষক যদি নতুন কোনো তথ্য পান তার ওপর ভিত্তি করে

যুক্তির কষ্টিপাথরে ওপরে উল্লেখিত বিবরণকে বিচার বিশ্লেষণ করে তবেই তা গ্রহণ বা বর্জন করবেন। উল্লেখ্য, এই কলেজে যোগদান (মার্চ, ২০০৩)-এর দু-তিন বছর পর থেকেই প্রায় সমবয়সী অধ্যক্ষ ড. অসীম কুমার দে মহাশয় এই কলেজের ইতিহাস লেখার ব্যাপারে আমার কাছে বেশ কয়েকবারই আন্তরিকভাবে প্রস্তাব রাখেন। বিভিন্ন কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অধ্যাপনা জীবনের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে 'প্লাটিনাম জুবিলি'র দৌলতে এই বিষয়ে একটা প্রচেষ্টা নিয়েছি মাত্র। উল্লেখ্য, এই কলেজের ইতিহাস লেখার ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে বৃহৎ কলেবরে এটাই প্রথম উদ্যোগ। এছাড়াও এই স্মারক গ্রন্থে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মহাবিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিক যেমন এর প্রতিষ্ঠা, সংস্কৃতি, খেলাধূলা, পঠন-পাঠন, কলেজের সামগ্রিক পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে তাঁদের চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, যেগুলি কলেজের সার্বিক চিত্র জানার পক্ষে সহায়ক হবে।

বস্তুত, ইতিহাস মানেই কেবল অতীত নয়। এর সঙ্গে বর্তমান এমনকি ভবিষ্যতও বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই বিষয়টি যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অতীত চর্চার কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি তথা বিশেষজ্ঞ সেই সংশ্লিষ্ট ঘটনার সাক্ষী হন না। স্বাভাবিকভাবেই অতীতের যে বিশেষ বিষয়টি সম্পর্কে তিনি চর্চা করেন সেজন্য তাঁকে যেমন সমকালীন বা প্রায়-সমকালীন তথ্যসমূহের ওপর নির্ভর করতে হয়, তেমনি এর পাশাপাশি তাঁকে তাঁর সমকাল (অর্থাৎ বর্তমান)-এর দ্বারাও বেশ কিছুটা প্রভাবিত হতে হয়। ঐতিহাসিক বেনেদিতো ক্রোচে সম্ভবত এই কারণেই বলেছেন, 'all history is contemporary history' অর্থাৎ 'সব ইতিহাসই সমসাময়িক ইতিহাস'। এর মূল কথা হল এই যে, বর্তমান কালের মানুষ অতীতকে দেখেন তাঁর সমকাল অর্থাৎ বর্তমানের আলোতে। স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান সমাজব্যবস্থায় অবস্থান করে তাঁকে অতীতের বিচার বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়। তাই ইতিহাসবিদ অশীন দাশগুপ্তরও বক্তব্য হল 'ঐতিহাসিক বর্তমানকে সঙ্গে নিয়ে চলেন'। এ প্রসঙ্গে ইংরেজ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড হ্যালেট কারও সম্ভবত ভুল বলেননি। 'What is History' গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি লিখছেন 'History is an unending dialogue between the past and the present' অর্থাৎ অতীত ও বর্তমানের মধ্যে অন্তহীন কথোপকথনই হল ইতিহাস।

নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের উত্থান ও বিকাশ সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে ইতিহাসের তত্ত্বগত কিছু ধারণার উল্লেখ করলাম এই কারণে যে কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৯৪৮)-র পঁয়তাল্লিশ বছর পর আমি এখানে যোগদান করেছি। স্বাভাবিকভাবেই ওই সময়ের কলেজের সার্বিক বিবরণ আমাকে লিখতে হয়েছে মূলতঃ বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া কিছু তথ্য (লিখিত ও মৌখিক)-র ওপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে এমনকি এই কলেজে আমার সময়কালের (১৯৯৩ - বর্তমান কাল) যেসব বক্তব্য তুলে ধরলাম সেগুলি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব ভাবনা। এ বিষয়ে

দ্বিমত থাকতেই পারে। গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে পুনর্মূল্যায়ণও হতে পারে।

শেষের দিকে লিখছি অথচ সেটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপুর্ণ এবং তা হল এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমি প্রথমে অধ্যাপনা (Fulltime Lien Vacancy) কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজে (আগষ্ট, ১৯৯১ - মার্চ, ১৯৯৩)। কিন্তু দু'বছরের Lien Vacancy অতিক্রান্ত হবার আগেই তৎকালীন স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের আমলে ১ এপ্রিল, ১৯৯৩ এই কলেজে যোগদান করি। তখন থেকেই এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি আমার কাছে হয়ে ওঠে মাতৃস্বরূপা। সংকল্প নিই এই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে আর কোথাও যাব না। অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী বন্ধুগণ, ছাত্র-ছাত্রী সকলের সঙ্গেই সুমধুর সম্পর্ক আমাকে মুগ্ধ করে তোলে। মনে মনে স্মরণ করতে থাকি এই কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল, তৎকালীন অসংখ্য গুণীজন (যাঁরা জমি, শ্রম, সাহস ও সাধ্যমতো অর্থ দিয়ে এই মহৎ উদ্যোগকে সহায়তা করেছিলেন) এবং বিশেষ করে ডাঃ পালের মাথার ওপর সবসময় যাঁর আশীর্বাদের হাত ছিল সেই বীর, মহান দেশপ্রেমিক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে। এঁদের সকলকে জানাই আমার বিনম্র ও সশ্রদ্ধ প্রণাম।

পরিশেষে বলি, যদি এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত না হত তাহলে স্বাধীনোত্তর পর্বে এই এলাকার সাধারণ ও অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হত সন্দেহ নেই। আজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আরামবাগ তথা আরামবাগ মহকুমার যে নিজস্ব পরিচিতি রয়েছে তার অনেকটাই অবদান রয়েছে এই মহাবিদ্যালয় তথা এখানে পাঠদানকারী অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দের, শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের এবং অবশ্যই পরিচালন সমিতি এবং অধ্যক্ষ মহাশয়দের। একটি ব্যক্তিগত কথা বলে এই প্রবন্ধের ইতি টানব। বস্তুত, শিক্ষার্থী ছাড়া শিক্ষক জীবন অসম্পূর্ণ। আমার অধ্যাপনা জীবনের সূচনাকাল (এপ্রিল, ১৯৮৭, পার্ট টাইম, শ্যামসুন্দর কলেজ) থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠন ও তাদের নৈতিক উন্নতি বিধানের আন্তরিক মানসিকতা নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম। নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে যোগদানের পর নেতাজীর আদর্শকে পাথেয় করে আমার পরিধি ও আয়ত্বের মধ্যে যতটা সম্ভব ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলেছি আজও। এছাড়া এই কলেজের গণ্ডির বাইরের ছাত্র-ছাত্রীরা ও এই কলেজের প্রাক্তনীরা যারা নিজেদের প্রয়োজনে শিক্ষা সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে পরামর্শ নিতে আসে তাদের কখনও নিরাশ করেছি বলে মনে হয় না। এদের সকলকে জানাই আমার স্নেহাশীষ। করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করি সকলের মঙ্গল হোক। আর বলি নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের উন্নতি ও সমৃদ্ধি আগামীদিনে (শতবর্ষ পূর্তিতে) সর্বোচ্চ সীমা স্পর্শ করুক।

## টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১। প্রাগৈতিহাসিক তথা প্রস্তর যুগের তিনটি পর্যায়। এগুলি হল যথাক্রমে পুরাপ্রস্তর, মধ্যপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগ। পুরাপ্রস্তর যুগের আদি পর্যায়ের সূত্রপাত ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে। এই যুগে মানব সংস্কৃতির একেবারে সূচনাপর্বে 'হোমো হাবিলিস' (প্রায়-মানুষ) এবং তারপর ধীরে ধীরে 'হোমো ইরেকটাস' ও পরে তা আরও বিবর্তিত হয়ে 'হোমো স্যাপিয়েন্স' তথা আধুনিক মানুষের রূপান্তর ঘটে। প্রসঙ্গত বলা যায় প্রস্তর যুগের প্রথম দুটি পর্যায় সাধারণভাবে 'খাদ্যসংগ্রহ' (Food Collection) এবং তৃতীয় পর্যায় (নব্যপ্রস্তর যুগ) সাধারণভাবে 'খাদ্য উৎপাদন' (Food Prodcuction)-এর পর্যায় হিসাবে সুপরিচিত। এই শেষোক্ত পর্যায়েই ভারতীয় উপমহাদেশে (মেহেরগড় ও সংলগ্ন অঞ্চলে) কৃষিকাজ, পশুপালন তথা গ্রামীণ সভ্যতার উন্মেষ ঘটে।

২। তাম্রপ্রস্তর যুগ (অর্থাৎ তামা ও পাথর উভয়ই যুগপৎ ব্যবহৃত হত), বিশেষ করে পরিণত ও নগরকেন্দ্রিক সিন্ধু/হরপ্পা সভ্যতার সাম্প্রতিক সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে আনুমানিক ২৬০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে ২০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত। সমসাময়িক মেসোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন (দুটি বিশেষ ধরণের তামার পুঁতি) এবং রেডিও কার্বন পদ্ধতির সমীক্ষা এক্ষেত্রে প্রধান হাতিয়ার। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, Dilip Kumar Chakraborty, *India : An Archaeological History*, 2nd edition, Oxford University Press, 2013, PP. 198-99

৩। এরকম মনে করা বোধহয় অসঙ্গত হবে না যে খ্রিস্টীয় উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত হুগলী জেলার কামারপুকুরের শ্রীযুক্ত গদাধর চট্টোপাধ্যায় (ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব) ও বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটীর শ্রী শ্রী মা সারদাদেবী এবং তাঁদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সম্ভবত এই পথেই আরামবাগে পৌঁছে সেখান থেকে হাঁটা পথে বিখ্যাত তেলো-ভেলোর দুর্গম এলাকা পার হয়ে তারকেশ্বর ও বৈদ্যবাটী হয়ে নদী (গঙ্গা) পথে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতেন।

৩এ। সুভাষচন্দ্র বসুর, তরুণের স্বপ্ন, কলকাতা, ১৯৬৭, পৃঃ ১৪৩।

৪। ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের ১০৮তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা-য় সম্পাদক স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ ঘোষের লেখা 'নিবেদন' অংশে উল্লেখিত।

৫। ঐ; দুলালচন্দ্র মাল, স্মরণিকা নেতাজী মহাবিদ্যালয়, রজত জয়ন্তী বর্ষ, ১৯৭৩ দ্রষ্টব্য।

৬। অশোক ঘোষ, 'আমার সহকর্মী ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল' ১০৮তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা, পৃঃ ১৪-১৫ দ্রষ্টব্য। উল্লেখ্য, বর্তমানে সুপরিচিত রামমোহন রায় পাঠাগার তখন পরিচিত ছিল 'জ্ঞানেন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি' নামে (প্রতিষ্ঠা কাল ১৯১১), ১৯৫০ সাল থেকে এটি রামমোহন রায় পাঠাগারে রূপান্তরিত হয়, সুধীর কুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, দ্বিতীয় খণ্ড, নতুন সংস্করণ, পৃঃ ৯৬৪-৬৫।

৭। বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, ঐ, নিবেদন অংশ, পৃঃ ৪; সুভাষচন্দ্র বসু বিষ্ণুপুর থেকে কোতুলপুর হয়ে প্রথমে বেঙ্গাই আসেন এবং তারপর আসেন আরামবাগ। উল্লেখ্য, ডাঃ পালের অনুরোধে বেঙ্গাই চৌমাথায় তাঁর কুঁড়েঘরে সুভাষ বসুর আগমন ঘটেছিল। এই কারণে তিনি বেঙ্গাই চৌমাথার নামকরণ করেন 'সুভাষনগর'। আনন্দমোহন মণ্ডল, ঐ, 'বিনম্র

শ্রদ্ধাঞ্জলি', পৃঃ ৩৯।

৮। চিঠিগুলি প্রেরণের সাল, তারিখ, স্থানের নাম ও প্রেরকের নাম পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হল -

ক) ১৯/৭/১৯৩৫, কার্লসবার্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, সুভাষচন্দ্র বসু

খ) ১৩/৩/১৯৩৬, বাদগাস্টাইন, অস্ট্রিয়া, সুভাষচন্দ্র বসু

গ) ৯/৮/১৯৩৭, ডালহৌসী (পাঞ্জাব), সুভাষচন্দ্র বসু

ঘ) ২৬/৫/১৯৩৮, রেলের পথে, সুভাষচন্দ্র বসু

ঙ) ৪/৯/১৯৪০, প্রেসিডেন্সি জেল, কলকাতা সুভাষচন্দ্র বসু

উল্লেখ্য, এই চিঠিগুলি ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পালের পুত্র শ্রী হরিসাধন পাল মহাশয়ের সৌজন্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে, নেতাজী মহাবিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৯৬-এ 'সুভাষ' নামাঙ্কিত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। চিঠিগুলি এই সংখ্যাটিতে নির্দিষ্ট জায়গায় পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

৯। এই চিঠিটির একটি জেরক্স কপি লেখাটির নির্দিষ্ট স্থানে দেওয়া হয়েছে।

১০। এই প্রচার পুস্তিকাটি ড. রণজিৎ গোস্বামীর নিবন্ধ "আমার ডাক্তারদা ঃ ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল" লেখাটি থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের ১০৮তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'স্মরণিকা', পৃঃ ৩১-৩৪। এজন্য তাঁর কাছে এবং ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল স্মৃতিরক্ষা সমিতির কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

১১। ঐ, পৃঃ ৩৩ দ্রষ্টব্য।

১২। দুলালচন্দ্র মাল, স্মরণিকা, নেতাজী মহাবিদ্যালয়, রজত জয়ন্তী বর্ষ, ১৯৭৩, পৃঃ ৫।

১৩। এই চিঠিটি শরৎচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিল ১ উডবার্ন পার্ক, কলকাতা-২০ থেকে। এটি এই প্রবন্ধের সংশ্লিষ্ট অংশে ছাপা হয়েছে।

১৪। সূত্রনির্দেশ ১২-র অনুরূপ, পৃঃ ৬।

১৫। 'নেতাজী মহাবিদ্যালয় পত্রিকা' (পরে নাম পরিবর্তন হয়ে হয় 'উৎসর্গ')-র প্রথম সংখ্যা (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯)-র সম্পাদকীয়তে স্পষ্টতই লেখা হয়েছে - "ছাত্র ইউনিয়নের 'সোস্যাল' শাখার পক্ষ থেকে কলেজে এক বৎসরের মধ্যে ছাত্রদের দ্বারা কয়েকবার নাট্যাভিনয় হয়েছে। অভিনয়গুলি খুবই প্রশংসনীয় হয়েছে। নাটকগুলির মধ্যে 'বিরিঞ্চিবাবা' ও 'প্রথম পুরস্কার' নাটক দুটি অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে।" আরো লেখা হয়েছে, "মাননীয় অধ্যক্ষ (শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ সেন) মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় কলেজের ছাত্রগণ বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়ে আগামী নভেম্বর মাসে এক বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন, যাতে জনসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকবে।" বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'নেতাজী মহাবিদ্যালয় পত্রিকা', প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ৪ দ্রষ্টব্য।

১৬। এই তথ্যটি প্রথম সবিস্তারে জানতে পারি সেই সময়ে (১৯৫৯) এই কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র মাল মহাশয় (আমার প্রাক্তন সহকর্মী)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। এই একই তথ্য লিখিত আকারে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন ১৯৫৯-৬০ বর্ষে এই কলেজে আই. এস. সি পাঠরত ছাত্র শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্তী মহাশয় (বর্তমানে আরামবাগ সংলগ্ন বসন্তপুরের বাসিন্দা) এবং সেটি এই স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিতও হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,

মীরা রায় (সেই সময় বিবাহিত) ছিলেন আরামবাগের সুধীরচন্দ্র রায় (মোক্তার) মহাশয়ের কন্যা। তাঁর জন্ম ১৯৩২ সালে। বিবাহ হয়েছিল গোতানের ভবানী ভঞ্জ-র সাথে। অতি সম্প্রতি মীরা ভঞ্জ (রায়)-র সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রে জানলাম, এখন বেশিরভাগ সময় কলকাতায় থাকেন ছেলের কাছে। আগে থাকতেন শ্বশুরালয় গোতানে ও আরামবাগ পল্লীশ্রীর বাড়িতে। আর রেনুকা পাল ছিলেন মুথাডাঙ্গার চারুচন্দ্র পালের কন্যা। তিনি চির অবিবাহিতা এবং আজও জীবিত।

১৭। ওপরে উল্লেখিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্তীর প্রবন্ধ "স্মৃতির অ্যালবামে আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে আমার অধ্যয়ন কাল" (এই স্মারক গ্রন্থে ধৃত) দ্রষ্টব্য।

১৮। দুলালচন্দ্র মাল, স্মরণিকা, নেতাজী মহাবিদ্যালয়, রজত জয়ন্তী বর্ষ, ১৯৭৩ পৃঃ ৫-৬।

১৯। এই তথ্যটি প্রদানের জন্য আমি শ্রদ্ধেয় ব্রজমোহন কুণ্ডু ও অধ্যাপক রণজিৎ গোস্বামীর কাছে কৃতজ্ঞ।

২০। বিস্তৃত জানার জন্য এই স্মারক সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় দুলালচন্দ্র মালের প্রবন্ধ "স্মৃতির সরণিতে নেতাজী মহাবিদ্যালয়" দ্রষ্টব্য।

২১। এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে কলেজের পঞ্চাশ বছর পূর্তি (সুবর্ণ জয়ন্তী) উপলক্ষ্যে কোনো স্মারকগ্রন্থ বা পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। তবে অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের সক্রিয় উদ্যোগে বেশ সাড়ম্বরে পঞ্চাশ বছর পূর্তির কাছাকাছি সময়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান পালিত হয়েছিল ১৯৯৬-১৯৯৭-এ। এ ব্যাপারে 'সুভাষ' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর ২০০৭-এ বর্তমান অধ্যক্ষ অসীম কুমার দে মহাশয়ের উদ্যোগে কলেজের ষাট বর্ষ হীরক জয়ন্তী পূর্তি পালিত হয় এবং সেই উপলক্ষ্যে একটি স্মারক নির্মিত হয়, যা সযত্নে রক্ষিত আছে মহাবিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে।

২২। স্মরণিকা, নেতাজী মহাবিদ্যালয়, রজত জয়ন্তী বর্ষ, ১৯৭৩, একেবারে শেষে 'পুনর্মিলন উৎসব সমিতির নিবেদন' অংশ দ্রষ্টব্য।

২৩। ঐ, পৃঃ ৫।

২৪। ঐ, পৃঃ ৭-৮।

২৫। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পরবর্তীকালে অধ্যক্ষ অসীমবাবুর সময়ে প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ডাকঘরটির স্থানের সামান্য পরিবর্তন ঘটে। গার্লস হোস্টেলের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ডাকঘরটিকে এর নীচে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এটি প্রসারিত করা হয়।

২৬। সাম্মানিক বিভাগগুলি হল ঃ বাংলা, ইংরাজি, সংস্কৃত, সাঁওতালি, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, ইকোনমিক্স, এডুকেশন, দর্শন, মিউজিক (সঙ্গীত), এ্যাকাউন্টেন্সি (কমার্স), বি. বি. এ, গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, কম্পিউটার সায়েন্স, বি. সি. এ ও এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স। পাসকোর্সের বিভাগগুলি হল ঃ ফিজিক্যাল এডুকেশন, প্ল্যান্ট প্রোটেকশন ও ইলেকট্রনিক্স। মোট ২১টি বিষয়ে অনার্সের মধ্যে সাতটি, যথা - সাঁওতালি, এডুকেশন, মিউজিক, বি. বি. এ., কম্পিউটার সায়েন্স, বি. সি. এ. ও এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স-এ অনার্স এবং ইলেকট্রনিক্স ও ফিজিক্যাল এডুকেশন পাশ কোর্স চালু হয়েছে অধ্যক্ষ ড. অসীম কুমার দে'র আমলে মূলত বর্তমান সমাজের প্রয়োজন ও চাহিদার

দিকে লক্ষ্য রেখে।

২৭। একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সাম্প্রতিককালে বিশেষ করে 'করোনা' পরবর্তী পর্বে গ্রন্থাগারে ছাত্র-ছাত্রী তথা সামগ্রিকভাবে উপস্থিতির হার লক্ষণীয় ভাবে কমে গেছে। এটা কাম্য নয়। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এই সমস্যার সমাধান হবে।

২৮। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, অতীতের প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য বেশির ভাগ সময়েই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না। তবে যেটুকু পাওয়া যায় তার সদ্ব্যবহার করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই 'ধ্রুবসত্য' বলতে পারার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। নীহাররঞ্জন রায়, *ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃঃ ৩৭, ৪০, ৪১ দ্রষ্টব্য।

Hotel Alexandria
Karlsbad
(Czechoslovakia)
২৬/৭/৫৫

প্রীতিভাজনেষু -
কল্যাণীয়,

[illegible]

[illegible] Vienna [illegible]

[illegible]

[illegible]

ইতি
শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

উদ্দেশ্যে :- শ্রী হরিসাধন পাল

Badgas in (Austria)

[illegible]

সৌজন্যে :- শ্রী হরিসাধন পাল

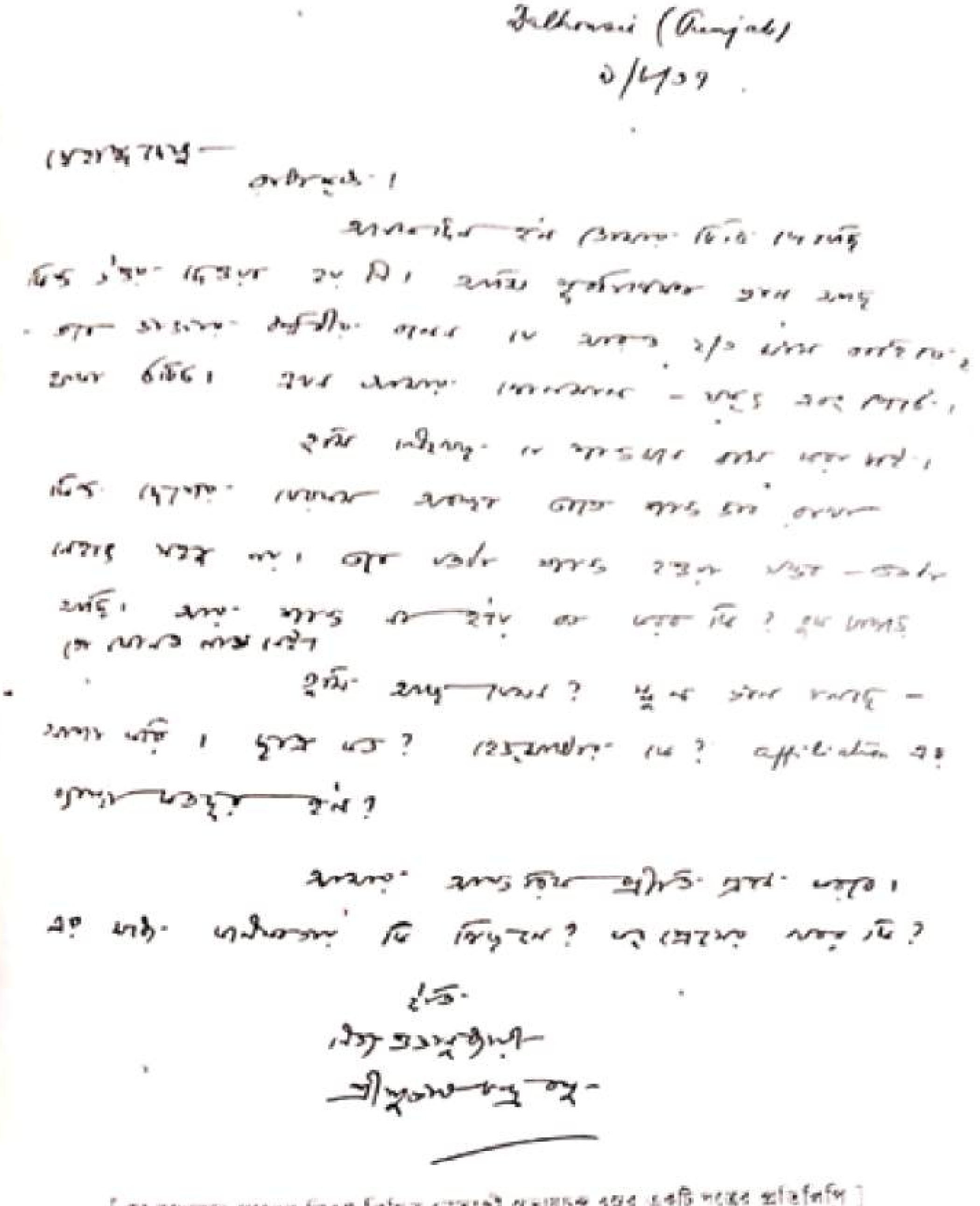
Dalhousie (Punjab)
3/6/37

... affiliation ...

[ ডঃ [illegible] নিকট লিখিত [illegible] একটি পত্রের প্রতিলিপি ]

OFFICE-BEARERS FOR 1938
President:
SUBHAS CHANDRA BOSE
Treasurer:
JAMNALAL BAJAJ
General Secretary:
J. B. KRIPALANI


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी
स्वराज भवन, इलाहाबाद
آل انڈیا کانگریس کمیٹی
سوراج بھون، الہ آباد
ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
SWARAJ BHAWAN, ALLAHABAD

Telephone: 341
Telegrams: "CONGRESS"
Ref.

[illegible]
২১/৫/৩৮

প্রীতিভাজনেষু —

[illegible]

আশা করি ভাল আছ। [illegible]
প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিবে।

ইতি
শুভার্থী
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

[illegible] :- শ্রী হরিসাধন পাল

Presidency Jail,
Calcutta,
৪/১২/৪০

CENSORED AND PASSED.
Passed
Dy. Supdt.
For D. C. S. B. 9/9

স্নেহাস্পদেষু —

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ইতি
শুভার্থী
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু —
(Subhas Chandra Bose)

Sr. Radha Krishna Pal
Bansai P.O.
Dt. Hooghly

সৌজন্যে :- শ্রী হরিসাধন পাল

1 Woodburn Park
Calcutta 20.
7. 7. 48

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

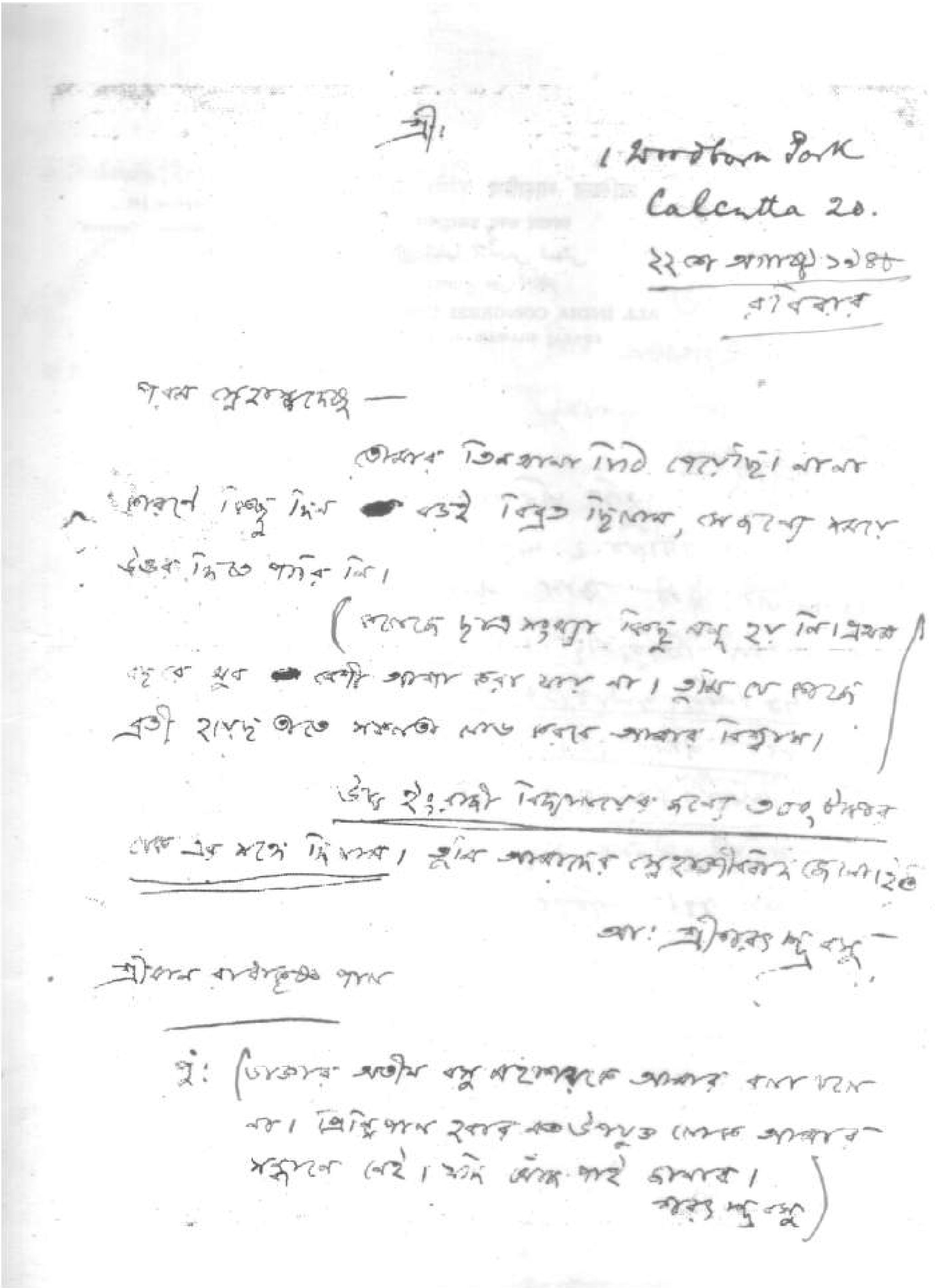

শ্রী

1 Woodburn Park
Calcutta 20.
২২শে আগষ্ট ১৯৪৮
রবিবার

পরম স্নেহাস্পদেষু —

তোমার [illegible] চিঠি পেয়েছি। [illegible] কিছু দিন [illegible] বিব্রত ছিলাম, সেজন্য সময় উত্তর দিতে পারি নি।

(আমার [illegible] কিছু ভাল হয় নি। [illegible] খুব বেশী [illegible] করা চলবে না। তুমি যে কাজে ব্রতী হয়েছ তাতে [illegible] আমার [illegible]।

[illegible] বিদ্যালয়ের জন্য [illegible] এর সঙ্গে দিলাম। তুমি আমাদের স্নেহাশীর্বাদ জেনো।)

আঃ শ্রীশরৎচন্দ্র বসু

শ্রীমান [illegible]

পুঃ (তোমার [illegible] আমার [illegible] না। [illegible] আমার [illegible] নেই। [illegible]।
শরৎচন্দ্র বসু)